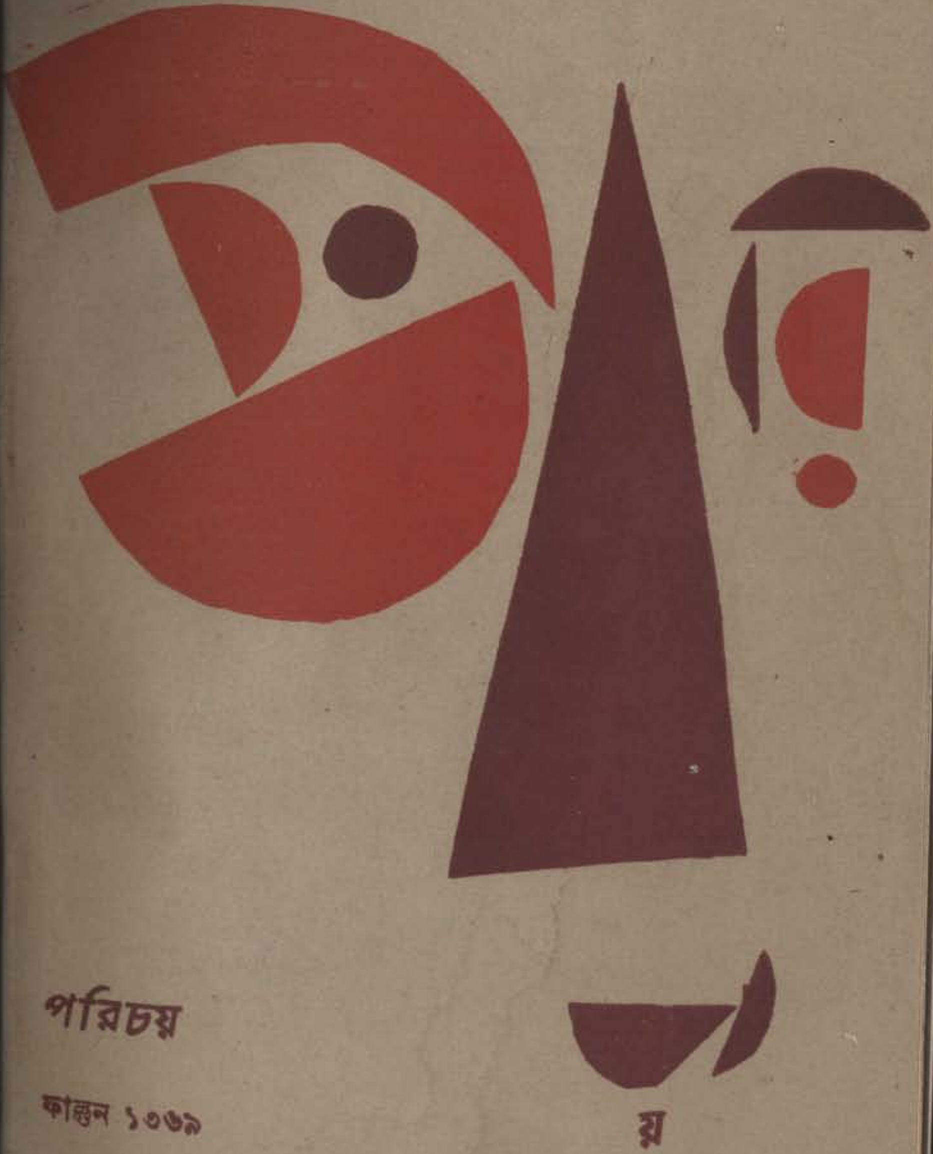


দাম: এক টাকা



পরিচয়

ফাল্গুন ১৩৬৯



সূচীপত্র

প্রচ্ছদ

পরিতোষ সেন

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

সমাজতন্ত্রে শিল্পচর্চা

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

শোনা যায় ইংরেজ ধনতন্ত্রের গোষ্ঠীপ্রধান উইনস্টন্ চার্চিল একদা নাকি পিকাসোর বিমূর্ত চিত্রকলা দর্শনে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর পশ্চাতে পদাঘাতের বাসনা প্রকাশ করেছিলেন। সম্প্রতি সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী শ্রীনিকিতা ক্রুশ্চভ মস্কোতে রুশ চিত্রকরদের বিমূর্ত শিল্প-প্রদর্শনী দেখে চিত্রগুলি গর্দভলাঙ্গুল দ্বারা অঙ্কিত বলে বিদ্রূপ করেছেন! যদি তিনি চিত্রগুলির নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যবিচারের পথে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন হয়তো আপত্তির কিছু ছিল না। কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে তাঁর দৃষ্টিতে ছবিগুলির একমাত্র ত্রুটি যে সেগুলি বিমূর্ত রীতিতে অঙ্কিত। বিমূর্ত শিল্পমাত্রেই রসনৈপুণ্যহীন বা সমাজতন্ত্র-বিরোধী—এ কথা স্বীকার করি না বলেই প্রথমে মনে হয়েছিল চার্চিলের রক্ষণশীল অশালীনতার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক নেতার চিন্তাধারার সাদৃশ্যটা নেহাতই ক্রুশ্চভের শিল্পরসজ্ঞানের অভাবজনিত ও ব্যক্তিগতরুচিপ্রসূত।

কিন্তু প্রাথমিক সন্দেহ ক্রমশই দুর্ভাবনায় পরিণত হলো যখন দেখলাম প্রদর্শিত চিত্রগুলির অঙ্কনরীতির বিরুদ্ধে সমালোচনাটা ব্যক্তিগত রুচির স্তর থেকে রাজনৈতিক বিধানের পর্যায়ে উঠে গেছে। শুনলাম মাত্র কয়েকদিন পরেই পূর্ব বার্লিনের এক সভায় ক্রুশ্চভ বলছেন—কমিউনিস্ট পার্টি কখনই 'বুর্জোয়া' শিল্প ও 'সোস্যালিস্ট' শিল্পের সহাবস্থান মেনে নেবে না। ইতিপূর্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নেতার মুখে এমন উক্তি শুনি নি। যদি বিমূর্ত শিল্পকে ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রতিভূ বলে নস্যাৎ করতে হয় তাহলে পিকাসোর সৃষ্টিকর্মকে কোন্ শ্রেণীভুক্ত করব? আমাদের দেশের উচ্চাঙ্গ রাগপ্রধান সঙ্গীত—যার কথামুক্ত শব্দ ও স্বরের শ্রুতিমধুর বিস্তারে কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রকাশ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর—তাকে কি 'বুর্জোয়া' শিল্প বলে অচ্ছুৎ করে রাখব?

প্রশ্নগুলি আরও স্পষ্টভাবে রাখা যেতে পারে। ধনতান্ত্রিক সমাজের রাজনৈতিক কাঠামোকে যে চোখে দেখি অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গিতে কি তার সাংস্কৃতিক

সৃষ্টিকর্মকেও আক্রমণ করব? অপর পক্ষে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যদি কোনো শিল্পী মার্কস্‌বাদ থেকে স্বতন্ত্র ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে শিল্পসৃষ্টি করেন, তবে তাঁর সৃষ্টিকর্মের বিচারের মানদণ্ড কী হবে? রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ না নন্দনতাত্ত্বিক বিচারবোধ? সবশেষে, রাজনীতির ক্ষেত্রে যে উপায়ে কমিউনিস্ট পার্টি কর্মসূচী নির্ধারণ করে প্রায় সেই একই পদ্ধতিতে সংস্কৃতি-সৃষ্টির নীতি স্থির করা কতখানি সমর্থনযোগ্য? এ প্রশ্নগুলি নিয়ে পরে আলোচনার ইচ্ছা আছে। আপাতত সোভিয়েত সংস্কৃতি-ক্ষেত্রের ইদানীংকালের পরিস্থিতির সম্যক মূল্যায়নটা প্রয়োজন। কারণ ক্রুশ্চভের মন্তব্যগুলি যে আকস্মিক নয়, তার প্রমাণ সম্প্রতি রুশ শিল্পী-সাহিত্যিকদের এক সভায় সোভিয়েৎ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদকের দীর্ঘ বক্তৃতা। শিল্পকলায় বাস্তবের সাদৃশ্যরচনা ও সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক জীবনের প্রতিফলন—সাম্যবাদ গঠনের কাজে সোভিয়েত শিল্পী সাহিত্যিকদের এটাই একমাত্র কর্তব্য বলে নির্দেশিত হয়েছে; এ থেকে বিচ্যুত হয়ে স্বতন্ত্র আঙ্গিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা অ-সমাজতান্ত্রিক কাজ বলে বিবেচিত হবে—এই মর্মে হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে।

মনে পড়ে গেল, ১৯৩৯ সালে ইউরোপে যুদ্ধের দুর্বিপাকে শিল্প-সাহিত্যের দুরবস্থা দেখে রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে বলেছিলেন: "মানুষের এই বিভাগটা ছিল বিশেষভাবে গুণীদের হাতেই, পালোয়ানদের হাতে নয়। আকবর বাদশাও গানের আসরে তানসেনকে মেনে চলেছেন, সেখানে তিনি যদি বাদশাহী করতেন তাহলে সে হতো সাংগীতিক ভূতের কীর্তন।…সাহিত্যে আজ পর্যন্ত আন্তরিক শ্রেষ্ঠতার আদর্শ বাহ্যিক শ্রেণীভেদের উপর নির্ভর করে নি—এখন পাশ্চাত্ত্য মহাদেশের কোনো কোনো প্রদেশে সামাজিক গোঁড়ামি সাহিত্য নিয়েও যদি ঠেলাঠেলি করতে থাকে তাহলে আমরা তাতে কেন যোগ দিতে যাব? (অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি থেকে)

ক্রুশ্চভের মন্তব্য বা রুশ কমিউনিস্ট পার্টির সভার সিদ্ধান্তকে সেদেশের ঘরোয়া ঘটনা বলে আমরাও হয়তো অনায়াসে উপেক্ষা করতে পারতাম। কিন্তু যেহেতু বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রানুরাগী মানুষমাত্রেই সোভিয়েত রাষ্ট্রের শুরু থেকেই সেদেশের যুগান্তকারী পরীক্ষার প্রতিটি স্তর সম্বন্ধে সংবেদনশীল তাই বর্তমান ঘটনার বিষয়েও তাদের প্রশ্ন উত্থাপনের অধিকার সাম্যবাদের আদর্শের প্রতি কর্তব্যপালনের বিশেষ অঙ্গরূপে স্বীকৃত হবে বলে আশা করি।

তাই সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্পীর স্বাধীনতা নেই—পশ্চিমী ধনতন্ত্রবাদের

এই একটানা অপপ্রচারের সঙ্গে আমরা কণ্ঠ মেলাতে রাজী নই এই কারণেই যে, এই অপবাদের সবচেয়ে বড়ো জবাব রুশ শিল্পীরাই দিয়েছেন বিমূর্ত চিত্র অঙ্কিত করে এবং তাঁর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আজ একথা স্বীকারের সৎসাহস থাকা প্রয়োজন যে কার্ল মার্কস ভবিষ্যৎ সমাজতন্ত্রের নাগরিকের যে শিল্প-সৃষ্টির স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাঁর দর্শনের ভিত্তিপ্রস্তরে নির্মিত পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সে সৃষ্টির পথ বহু বাধা-বিঘ্নে কণ্টকিত। মনে রাখা দরকার, এক যুগে যে সব প্রতিবন্ধ ঐতিহাসিক প্রয়োজনের তাগিদে আরোপিত হয়েছিল, পরবর্তী যুগে সেই রীতির অহেতুক ও মারাত্মক অনুসরণের ভুক্তভোগী বর্তমান সোভিয়েত সংস্কৃতি জগত। রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রক্ষমতার পুরাতন অনমনীয়তা অনেকটা শিথিল হলেও, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বহুকালের ঘনীভূত বরফ আজও সম্পূর্ণ গলেছে কিনা সন্দেহ।

সোভিয়েত সংস্কৃতির অতীত

রাষ্ট্রের সঙ্গে সোভিয়েত শিল্পীর সম্পর্কের সমস্যাটা খুব সুস্পষ্টরূপে উন্মীলিত করেছিলেন বিপ্লবের কিছু পরে বিখ্যাত রুশ কবি অ্যালেগ্‌জ্যাণ্ডার ব্লক্ যিনি স্বদেশে আজও মহৎ কবি রূপে সম্মানিত। বিপ্লব ও সদ্য-প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতি স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে কাব্য-রচনা করলেও, নূতন সমাজব্যবস্থায় কাব্যচর্চার যে অস্বাচ্ছন্দ্য তাঁকে পীড়িত করে তুলছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় মৃত্যুর কিছু পূর্বে তাঁর একটি মন্তব্যে: "The Bolsheviks do not hinder the writing of verses but they hinder you from feeling yourself a master ; he is a master who feels the axis of his creativeness and holds the rhythm within himself."

শিল্প-সৃষ্টির মেরুদণ্ডকে এইভাবে রাষ্ট্রকরায়ত্ত করার মধ্যেই বর্তমান সোভিয়েত সংস্কৃতি-জগতের সমস্যাগুলি নিহিত রয়েছে। এর সঙ্গে মনে রাখা দরকার, রাষ্ট্রের এই অভিভাবকত্ব প্রতিষ্ঠার সূচনায় সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের নূতন সংস্কৃতিগঠনের মহৎ উদ্দেশ্য প্রেরণারূপে কাজ করেছিল।

বিপ্লবের অব্যবহিত পরে সদ্য প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যে অভূতপূর্ব সংস্কৃতিচর্চার বিস্তৃত ক্ষেত্র উদ্‌ঘাটিত হয় তাতে পরীক্ষামূলক চিত্ররচনা সর্বাগ্রগণ্য স্থান গ্রহণ করেছিল। পশ্চিম ইউরোপে আধুনিক বিমূর্ত শিল্পের

প্রবক্তাদের মধ্যে যাঁরা প্রবীণ তাঁরা হয়তো ভুলে গেছেন এবং যাঁরা নবীন তাঁরা হয়তো জানেনই না যে, আধুনিক চিত্রকলা জগতের পূর্বসূরীরা নব্য আঙ্গিক সন্ধানের পথে সর্বাধিক উৎসাহ পেয়েছিলেন তৎকালীন রুশ বিপ্লবের আদর্শ থেকে। ধনতান্ত্রিক জগতের অতীতাশ্রয়ী নির্জীব বাস্তবানুকারী শিল্পচর্চার বিরুদ্ধে তাঁরা নিজেদের চিত্ররচনার বিমূর্ত ধারাকে রাজনৈতিক বিপ্লবের সাংস্কৃতিক পার্শ্বচর বলে দাবি করেছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন রুশদেশীয়; যেমন, ম্যালেভিচ্ বা শাগল। স্বভাবতই এঁরা বিপ্লবোত্তর রাশিয়াকেই নূতন শিল্প-চর্চার অনুকূল পরিবেশরূপে গ্রহণ করেছিলেন। সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রথম কয়েক বৎসর তাই সংস্কৃতি জগতে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবকাশ দেখা দিয়েছিল। পরিমিতির অভাব যে ঘটেনি তা নয়। অতি-উৎসাহের ঝোঁকে 'বামপন্থী শিল্প' নামাঙ্কিত শুধু টেকনোলজি-নির্ভরশীল একজাতীয় চিত্ররচনা ও স্থাপত্যশিল্পের প্রাবল্য দেখা দিয়েছিল। চিত্রাঙ্কণের প্রাথমিক জ্ঞান আয়ত্ত করার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকারও করা হয়েছিল। কিন্তু সব সত্ত্বেও সোভিয়েত সংস্কৃতির এই প্রারম্ভিক যুগে যেটা সবচেয়ে বেশি উৎসাহোদ্দীপক ছিল সেটা রাষ্ট্রনেতা ও শিল্পী-সাহিত্যিক উভয়েরই সরল চিন্তার দুঃসাহস, নানা ভাঙা-গড়ার ভেতর থেকে নূতন জগত তৈরি হবে—এই স্থির বিশ্বাস। তাই মায়াকভ্‌স্কির প্রথম যুগের 'ফিউচারিস্ট' কবিতার সুখ্যাতি করতে না পেরেও লেনিন তাঁর পরীক্ষামূলক চরিত্র সম্বন্ধে সহিষ্ণুভাব অবলম্বন করেছিলেন। আর আজ একথাও স্বীকার করতে হবে যে কনস্ট্রাক্টিভিজ্‌ম্, ফিউচারিজ্‌ম্, সিম্বলিজ্‌ম্—ইত্যাদি নানা প্রবণতার উত্থান-পতনেরই সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার ব্লক্, মায়াকভ্‌স্কি, এসেনিন্ ও পাস্তেরনাকের মতো বলিষ্ঠ কবি।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এ শিল্প-সাহিত্য যাদের উপভোগের জন্য সৃষ্টি হচ্ছিল তারাই তখন অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। প্রাথমিক শিক্ষারই যেখানে অভাব, সেখানে নতুন আঙ্গিকে অঙ্কিত চিত্রাবলী বা প্রচলিত রীতি বহির্ভূত ভাষায় রচিত কাব্য কতজনের বোধগম্য হবে? ১৯২০ সালে ক্লারা জেটকিনকে এ প্রসঙ্গে লেনিন যা বলেছিলেন, তা স্মরণযোগ্য—"Are we to give cake and sugar to a minority when the mass of workers and peasants still lack black-bread ?...For art to get closer to the people and the people to art we must start by raising general educational and

cultural standards." তাই দেশগঠনের ব্যাপক পরিকল্পনারই এক বিশেষ অঙ্গরূপে জনশিক্ষার উপর সমগ্র প্রবণতা গিয়ে পড়ল। এ ক্ষেত্রে শিল্পীর দায়িত্ব সম্পর্কেও লেনিনের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য—"প্রত্যেক শিল্পীর, এবং যারা নিজেদের শিল্পী বলে মনে করে, প্রত্যেকেরই, স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করার অধিকার আছে, সর্বস্ব পণ করে নিজের আদর্শ অনুসরণের ক্ষমতা আছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা কমিউনিস্ট এবং নীরবে দাঁড়িয়ে অরাজকতার অপ্রতিহত বিস্তার হতে দিতে পারি না। নির্ধারিত পরিকল্পনা-অনুযায়ী এই প্রক্রিয়াকে পরিচালনা করতে হবে এবং এর ফলগুলিকে সুনিরূপিত করে তুলব।" (ক্লারা জেট্‌কিনের স্মৃতিকথা)

ভবিষ্যৎ নূতন সংস্কৃতি সৃষ্টির ভিত্তিস্থাপনের জন্য সোবিয়েত রাষ্ট্র কর্তৃক শিক্ষা বিস্তার ও শিল্প-সাহিত্যের যুগপৎ অভিভাবকত্ব গ্রহণের ফল কিন্তু অবিমিশ্র আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিল না।

একদিকে যেমন শুরু থেকেই সংস্কৃতিমুখীন জনশিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপের ফলে মাত্র অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই সোভিয়েত সরকার রুশ জনসাধারণের কাছে বিশ্বের শিল্প-সাহিত্যকে ব্যাপক ও অনায়াসলভ্য করে তোলার অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেছে, অন্যদিকে বিপ্লবের পরে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে ভবিষ্যৎ সোভিয়েত সৃষ্টিশীল শিল্পের সুস্পষ্ট কাঠামো তৈরি হবার সুযোগ দেখা দিয়েছিল, তা অচিরেই বিনষ্ট হলো। শাগল, ক্যান্‌ডিনস্কী এবং অনেকেই দেশত্যাগী হলেন। তাঁদের সৃজনশীল শিল্পকর্মের পরিবর্তে এক জাতীয় প্রচারধর্মী চিত্রকলা ও শস্তা বোধগম্য উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য জনশিক্ষার পরিকল্পনার অঙ্গরূপে গৃহীত হলো। রুশ জনসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতি-বিষয়ক প্রাথমিক বোধবিস্তারের প্রয়োজনে এই 'প্রোলেটারিয়েট সংস্কৃতির' একটা সাময়িক মূল্য ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এটাই একমাত্র নির্ভেজাল সোভিয়েত সংস্কৃতিরূপে রাষ্ট্রের অনুমোদন লাভ করে একটা স্থায়ী আসন পেয়ে গেল। ফলে একটা অভূতপূর্ব বৈপরীত্য লক্ষ্য করছি। দেশব্যাপী শিক্ষিত জনসাধারণ দেশবিদেশের শ্রেষ্ঠ শিল্প দেখে, ধ্রুপদী সাহিত্য পড়ে বা উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত শুনে রসগ্রহণে অভ্যস্ত। এইভাবে তাদের যে সাংস্কৃতিক মান উন্নত হয়েছে, আশা করা গিয়েছিল তাতে সঞ্জীবিত শিল্পীমানসের সৃষ্টিকর্মে নিত্যনতুন চিন্তার চমক থাকবে, তার সাহিত্য পাঠকের ভাবনাজগতে তর্ক-বিতর্কের ঢেউ তুলবে।

অথচ সোভিয়েত ইউনিয়নের গত প্রায় অর্ধশতাব্দীকালের ইতিহাসে সেই পুরাতন প্রোলেটারিয়েট কালচারের ধারা অনুসরণ করে শিল্পকলার ক্ষেত্রে প্রাচীরপত্রের আদর্শে বাস্তবজগতের নির্জীব সাদৃশ্যরচনা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্রমজীবীর কর্মোদ্যমকে বাঙালী বৈষ্ণবী সংকীর্তনের কায়দায় অপরিমিত ভাবপ্রবণতা সহকারে সুখ্যাতির রেওয়াজটাই সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির চূড়ান্ত প্রকাশ বলে উচ্চ-প্রশংসিত হয়ে এসেছে। এর মধ্যে মরূদ্যানের মতো মাঝে মাঝে দু-একটি সৃষ্টিকর্ম বহির্জগতকে সচকিত করেছে। কিন্তু অধিকাংশের অনুসৃত বাঁধা সড়ক থেকে বিচ্যুত হয়ে স্বল্প সংখ্যক শিল্পী-সাহিত্যিক সমাজতন্ত্রের প্রতি আস্থায় অবিচল থেকেও স্বতন্ত্র পথে যখনই এগোতে চেয়েছেন, তখনই অভিভাবকের ভ্রূকুঞ্চন তাঁদের নিবৃত্ত করেছে। অনুমোদিত রাস্তার বাইরে অবৈধ পদক্ষেপের স্বল্পকালীন অবকাশ ও তৎপরবর্তী আত্ম-সমালোচনার গঙ্গাজলে শুদ্ধিকরণ—এই দ্বিবিধ প্রক্রিয়ায় সোভিয়েত সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ।

স্তালিন যুগ ও বর্তমান :

এ অবস্থার জন্য সমস্ত দোষ স্তালিনের উপর আরোপের যে প্রবণতা ক্রমশই প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে, তা একজাতীয় একদেশদর্শিতা ছাড়া আর কিছু নয় ; কারণ, এ ধরনের সমালোচনায় উপেক্ষা করা হয় সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীর একটি মৌলিক উপাদানকে—অর্থাৎ, সংস্কৃতির বিকাশ, পরিচালনা ও তার রূপ নির্ধারণ করার নীতি। স্তালিনের আমলের শেষ পর্যায়ে যেমন অন্যান্য ক্ষেত্রে পার্টি নীতি নির্মমভাবে প্রযুক্ত হয়েছে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তাকে অনুরূপ পদ্ধতিতে আরোপিত করা হয়েছে। বর্তমানে সে রক্তাক্ত প্রয়োগরীতির অবসান ঘটলেও, মৌলিক নীতির কোনো পরিবর্তন হয়েছে কিনা সন্দেহ।

স্তালিনোত্তর যুগে যে 'বরফ গলার' কথা প্রায়শই শোনা যায়, তার নজির অতীতেও রয়েছে। রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানের নিরবচ্ছিন্ন হিমপ্রবাহে আশীর্বাদস্বরূপ ভাঁটা পূর্বেও দু-একবার পড়েছে। বিশেষ করে ১৯৩২ সালে, 'প্রোলেটারিয়েট কালচারের' দাবি করে 'রুশ শ্রমজীবী লেখক সংস্থা' (RAPP) যখন সোভিয়েত সাহিত্যকে এক বদ্ধ গণ্ডীর' মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলেছিল, তখন তাকে মুক্তি দেবার প্রচেষ্টায় স্তালিন সংস্কৃতিক্ষেত্রে কিছুটা উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন ঐ কুখ্যাত সংস্থাটিকে ভেঙে দিয়ে। এই কারণেই সে সময় লুই

ফিশর স্তালিনের সিদ্ধান্তকে "A Revolution in Revolutionary History" বলে অভিবাদন জানিয়েছিলেন। আজকের সাম্যবাদী মহলে স্তালিন-বিরোধী শুচিবায়ুগ্রস্ত আবহাওয়ায় একথাও স্মরণযোগ্য যে, RAPP-এর প্ররোচনায় মায়াকভ্‌স্কির আত্মহত্যার পর তাঁর বিতর্কমূলক সাহিত্যকর্মকে যখন "অসমাজতান্ত্রিক" আখ্যা দিয়ে একঘরে করে রাখার কথা অনেকে চিন্তা করছিলেন, তখন একমাত্র স্তালিন-ই তাঁর সমর্থনে এসে বলেন "Mayakovsky was and is the most talented poet of our Socialist epoch and indifference to his memory is a crime."

অবশ্য স্তালিন-যুগের শেষাঙ্কের নিপীড়নের কালিমালিপ্ত ইতিহাস অতীতের এই উদারনীতির পরিচ্ছেদকে মেঘাচ্ছন্ন করে রেখেছে। ১৯৩৪ সালের পর চতুর্দিকের শত্রু-পরিবেষ্টিত রাশিয়ায় অন্তর্বিরোধের আবহাওয়ায়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন বন্ধু সমালোচক বা সমাজতন্ত্র-সমর্থক হয়েও সরকারী রীতি থেকে স্বতন্ত্র প্রবক্তা হলেই তাকে সাম্রাজ্যবাদীর চর সন্দেহে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হলো, ঠিক তেমনই শিল্পের ক্ষেত্রে বাঁধা রাস্তা থেকে সামান্যতম বিচ্যুতিও আর সহিষ্ণুতার চোখে দেখা হলো না। চিত্রকলায় বাস্তবানুকারী ব্যতীত অন্য সমস্ত রীতিই 'বুর্জোয়া ডেকাডেন্ট্‌ ফর্ম্যালিজ্‌ম'-এর আওতায় ফেলা হলো এবং সাহিত্যে সমাজব্যবস্থার ক্ষীণতম সমালোচনা হলেই চিৎকার উঠল— "প্রতি-বিপ্লবী ভাবধারা।" দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন অস্বাভাবিক অবস্থায় যে আতঙ্কপ্রসূত অসহিষ্ণুতা কিছুটা বোধগম্য, পরবর্তী স্বচ্ছন্দ আন্তর্জাতিক আবহাওয়ায় সেটা অমার্জনীয় হয়ে দাঁড়াল। এই ভাবধারা চরম উগ্র পরিণতি পেল ১৯৪৬ সালে যখন ঝানভ্‌ একে একটা মার্কসীয় তত্ত্বরূপে দাঁড় করালেন। আরও হাস্যকর হলো যখন এই তত্ত্বের প্রয়োগ করে ফরাসী কমিউনিস্টরা সাত্র্‌ প্রমুখ বুদ্ধিবাদীদের সৃষ্টিকর্মকে কবরস্থ করলেন এবং কিছু পরে এর ঢেউয়ের ধাক্কায় আমাদের দেশের মার্কসবাদী সমালোচনায় রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রত্যেকেই নস্যাৎ হলেন।

অবশ্য এর প্রায়শ্চিত্ত যথোপযুক্তভাবেই হয়েছে। তাই এই লজ্জাজনক অতীতকে আবার স্মরণ করে আত্মলাঞ্ছিত হবার বাসনা ছিল না, যদি বর্তমানেও সোভিয়েত সংস্কৃতিতে তার ছায়া পুনরায় না দেখতাম।

আশা করেছিলাম বিংশতি পার্টি কংগ্রেসের পর বহুল প্রচারিত 'বরফ গলার' আবহাওয়ায় রাশিয়ায় সংস্কৃতি-সৃষ্টির প্রাথমিক উপাদান, অর্থাৎ রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ

ব্যতীত নির্ভাবনায় শিল্পীর স্বাধীনভাবে শিল্পচর্চার অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। লেনিনের নীতিতে প্রত্যাগমনের কথা বহুবার ঘোষণার ফলে মনে হয়েছিল, বিপ্লবের অব্যবহিত পরবর্তী রাশিয়ার সংস্কৃতিক্ষেত্রে ভিন্ন প্রবণতার যে সহাবস্থান প্রচলিত ছিল, তার সম্ভাবনা হয়তো পুনরুজ্জীবিত হবে। অন্তত রাষ্ট্রনেতাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে লেনিনের সহনশীলতা ফিরে আসবে বলে আশা করেছিলাম।

কিন্তু বিমূঢ় হলাম যখন দেখলাম বোরিস পাস্তেরনাকের নূতন উপন্যাস নিয়ে সেদেশে একজাতীয় শত্রুভাবোন্মত্ততা সৃষ্টি করা হলো। শুরুতেই বলে দরকার যে, 'ডক্টর ঝিভাগো' পড়ে—বিষয়বস্তু বা আঙ্গিক—কোনো দিক থেকেই আমার খুব মহৎ উপন্যাস বলে মনে হয় নি। বিদেশের কিছু বুদ্ধিজীবী এবং তাঁদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমাদের দেশেরও কিছু 'সংস্কৃতির স্বাধীনতা'র ভেকধারী যখন এই বিশেষ উপন্যাসটির ভিত্তিতে পাস্তেরনাককে টমাস মান বা তলস্তয়ের সমগোত্রীয় বলে দাবি করেছিলেন, তখন তাঁদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক ধর্মান্ধতায় বেশ কৌতুকবোধ করেছিলাম। মনে হয়েছিল হয় তাঁরা 'ডক্টর ঝিভাগো' পাঠ করেন নি কিংবা মান-তলস্তয়ের উপন্যাসের রস-গ্রহণে অপারগ।

যদিও বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নে পাস্তেরনাকের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে আবার স্বচ্ছতা ফিরে এসেছে বলে বোধ হচ্ছে, কিন্তু কিছুকাল পূর্বে সেদেশে 'ডক্টর ঝিভাগো'র প্রকাশ নিষিদ্ধ করে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাতে মনে হয়েছিল স্বতন্ত্র ভাবধারা সম্বন্ধে সেই অতীতের আতঙ্কের জের এখনও কাটে নি। পাস্তেরনাকের বিরুদ্ধে তৎকালীন জেহাদ ঘোষণার উত্তেজনার মধ্যে সোভিয়েত সমালোচকেরা যেভাবে তাঁর কবিকৃতির কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিলেন, সেই ক্ষীণ দৃষ্টিপ্রসূত একদেশদর্শিতাই সোভিয়েতের—কি রাজনৈতিক কি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে—সমস্ত অন্তর্বিরোধের মূলসূত্র।

ঠিক অনুরূপ পরিস্থিতি উল্লিখিত বিমূর্ত চিত্রপ্রদর্শনীর ঘটনাটি কেন্দ্র করে তৈরি হচ্ছে। এ-জাতীয় ঘটনা ধনতান্ত্রিক সমাজের সুশিক্ষাবিহীন আমলা-তান্ত্রিক আবহাওয়াতেই শোভা পায়। কিন্তু ব্যথিত হই, বিশ্বমানবের মুক্তির প্রতিশ্রুতি নিয়ে যে মার্কসীয় দর্শনের জন্ম তার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার নেতৃবৃন্দ যখন শিল্পীর স্বাধীনতায় ঠিক একইভাবে হস্তক্ষেপ করেন।

মার্কসবাদ ও সংস্কৃতিতে পার্টি-নেতৃত্ব

সুতরাং আজকে বিচার করার দিন এসেছে শিল্প-সাহিত্যে কমিউনিস্ট পার্টির বা সোভিয়েত রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধান মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে কতখানি সঙ্গত।

রবীন্দ্রনাথ একবার লিখেছিলেন, "সাহিত্যে রাষ্ট্রনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক মনস্তত্ত্ব প্রকাশ পায় না তা বলি নে, কিন্তু সে যদি ফৌজদারি মামলা চালাবার মোক্তারি করতে ব্যস্ত হয়ে বেড়ায় তাহলে দেশ-বিদেশের সাহিত্যে মড়ক লাগবে যে।" (অমিয় চক্রবর্তীকে ১৯৩৯ সালে লেখা চিঠি)।

বস্তুত, সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ প্রয়োগ করে সমাজের ও শ্রেণীস্বার্থের প্রতিফলন আবিষ্কার করা যেতে পারে। কিন্তু সাহিত্য রচনায় সাহিত্যিক কিভাবে মার্কসবাদী তত্ত্ব প্রয়োগ করবেন এবং করতে কতটা বাধ্য— এ প্রশ্ন বোধহয় অবান্তর। মার্কসবাদ একটা জীবন-দর্শন। আদর্শরূপে কেউ যদি তা গ্রহণ করেন তবে সেটা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই রূপায়িত করবে এবং তাঁর শিল্পকর্মেও তার পরোক্ষ প্রকাশ ঘটবে। ছক বেঁধে তাকে সৃষ্টিকর্মে প্রয়োগের প্রচেষ্টা হাস্যকর। কারণ, শিল্প-সৃষ্টি অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সমগোত্রীয় নয়। মানুষের কল্পনা জ্যামিতিক নিয়ম অনুসরণ করে চলে না।

এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যটা খুব স্পষ্ট ও দ্বিধাশূন্য এবং সেই কারণেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। তাঁর উল্লিখিত পত্রের আরেকটি অংশে লিখেছিলেন : "রসের দিক থেকে মানুষের ভালোমন্দ লাগা কোনো বাহ্য মতকে মানতে বাধ্য নয়।···কবির কল্পনা এবং কবির মত একজোট হবার দরকার নেই। শালের কাঠ এবং শালের মঞ্জরীর প্রকাশ স্বতন্ত্র। মার্কসিজমের ছোঁয়া কারো কবিতায় যদি লাগে, অর্থাৎ কাব্যের জাত বাঁচিয়ে লাগে, তাহলে আপত্তির কথা নেই, কিন্তু যদি নাই লাগে তাহলে কি জাত তুলে গাল দেওয়া শোভা পায়? কেমিস্ট্রির ল্যাবরেটরি যদি ভালোয় ভালোয় জুড়তে পারো রান্নাঘরে তবে সায়েন্সের জয়জয়কার করব। কিন্তু নাই যদি পারো তাহলে হারজিতের তর্ক তুলব না, ভোজনটার ব্যাঘাত না হলেই হল।"

সাহিত্য সম্বন্ধে কার্ল মার্কসের উদারনৈতিক সার্বজনীন রুচি এই সত্যেরই স্বাক্ষর বহন করে। শেক্সপীয়র, স্কট, হাইনের মতো ভিন্ন যুগের ভিন্ন মতাবলম্বী সাহিত্যিকের রচনার সার সংগ্রহে তাই তাঁর কোনো আপত্তি ছিল না।

আর সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বক্তব্য পাওয়া যায়, তাতে দেখতে পাই বর্তমান সোভিয়েতের সংস্কৃতিক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অভিভাবকত্ব যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তদানীন্তন ধনতান্ত্রিক জগতের সাহিত্যক্ষেত্রে ঠিক তার অনুরূপ ঘটনার বিরুদ্ধে মার্কস্ প্রতিবাদমুখর। প্রুশ সংবাদপত্র বিবাচনের অনমনীয় নিয়মাবলী প্রসঙ্গে তাঁর কয়েকটি কথা চিরস্মরণীয় :

"The law allows me to write, but on the condition that I write in a style other than my own. I have the right to show the face of my spirit, but I must first set it in the prescribed expression! What man of honour would not blush at such presumption and prefer to hide his head under his toga?······ You do not demand that a rose should have the same scent as a violet but the richest of all, the spirit, is to be allowed to exist in only one form?' ('On Style': শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে মার্কস্-এঙ্গেলসের নির্বাচিত রচনার সংকলন থেকে)

উক্ত সংকলনেই সাহিত্যিকের কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁর একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

"The writer must naturally make a living in order to exist and write, but he must not exist and write in order to make a living··· The writer in no way regards his works as a means, they are ends in themselves; so little are they a means for him and others that, when necessary, he sacrifices his existence to theirs." ('The Writer's Profession')।

এই জাতীয় কয়েকটি মন্তব্য ছাড়া, শিল্প-সাহিত্য সম্বন্ধে মার্কস বা এঙ্গেলস কোনো তত্ত্বগত সিদ্ধান্ত সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করেন নি খুব ন্যায়সঙ্গত ভাবেই। সংস্কৃতির বিকাশের নিজস্ব ধারা আছে। ফতোয়া জারী করে নতুন সংস্কৃতি সৃষ্টি করা চলে না। শ্রেণী সংগ্রামপ্রসূত রাজনীতির দুই শিবিরকে শিল্প-সাহিত্যে আমদানী করতে গিয়ে নকল বুঁদির গড়ের লড়াই ছাড়া আর কিছুই হয় নি।

যে বিমূর্ত চিত্রের প্রদর্শনী দেখে ক্রুশ্চভ বিক্ষুব্ধ হয়েছেন, সেগুলি আমরা এখানে কেউ-ই দেখি নি। তাই তার গুণাগুণ বিচার করা সম্ভব নয়।

স্বীকার করি, হয়তো এর মধ্যে অনেকগুলিই অপরিণত ও অনুপযুক্ততার দোষে অপরাধী। পশ্চিম ইউরোপে বিমূর্ত শিল্পের নামে 'অ্যাক্‌শন পেন্টিং'-এর যে রীতি প্রচলিত হয়েছে, সেই হাস্যকর ধারার অনুকরণও হয়তো থাকতে পারে। এবং সেগুলি কোনো দর্শকের কাছে অত্যন্ত নিন্দনীয় মনে হতে পারে।

কিন্তু ছবির নন্দনতাত্ত্বিক মূল্য যাচাই করার চূড়ান্ত ভার নিক দর্শক সাধারণ—বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের দর্শক-সাধারণ, যাদের সৌন্দর্য-বোধ ও দেখবার চোখ তৈরি হয়েছে শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বের সেরা চিত্রসামগ্রী দেখে। এই বোধই তাদের চিত্রের মানবিচারে সাহায্য করবে বলে আশা করি—কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্ত নয়, বা মার্কসবাদী তত্ত্বও নয়। প্রায় অর্ধশতাব্দীকালব্যাপী শিক্ষার মাধ্যমে তৈরি হওয়া এই ব্যক্তিগত বোধ-শক্তি ছবির বিচারের মানদণ্ড না হয়ে যদি জাত তুলে মার্কসবাদকে তার নির্ধারক করতে হয়, তাহলেই সন্দেহ জাগে যে—সোভিয়েত রাষ্ট্র তার সৃষ্টিশীল বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত জনসাধারণ সম্বন্ধে আজও দ্বিধাগ্রস্ত।

বিমূর্ত ও বাস্তবানুকারী শিল্প

আলোড়নটা যখন বিমূর্ত চিত্ররচনা সম্বন্ধে উঠেছে তখন বিশেষ করে এই বিমূর্ত চিত্রকলা সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলা প্রয়োজন। মনে হয় রুশ মার্কসবাদী চিত্র-সমালোচনার সবচেয়ে বড়ো ব্যর্থতা—বিমূর্তিকরণকে চিত্রকলার একটি বিশেষ অঙ্গ এবং বিমূর্ত শিল্পকে তার ক্রমবিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর হিসেবে দেখার অক্ষমতা।

যেহেতু আকৃতিগত সাদৃশ্য শিল্পের বিষয় নয়—বরং শিল্পীর ভাবাভাসে রূপায়িত বাস্তব জগৎ বা রঙ ও রেখার ছান্দসিক সমাবেশে ভাবাভিব্যক্তি; তাই এক জাতীয় বিমূর্তিকরণ বা 'নন-রিপ্রেজেন্টশন', বাস্তবের বিকৃতি বা অত্যুক্তিরূপে শিল্পের ইতিহাসের গোড়া থেকেই সর্বজনস্বীকৃত। আমাদের প্রাচীন ভাস্কর্যে মনুষ্যদেহের বলিষ্ঠ বিকৃতিতেও কি বিমূর্তিকরণ পাই না? আসলে বিশেষ কোনো বস্তুকে অবলম্বন করে নেই, এমন যে সব রঙ ও রেখা—তাদের সমন্বয়ের যে নন্দনতাত্ত্বিক আবেদন—তার সবচেয়ে বড়ো উৎস আমাদের প্রাকৃতিক জগৎ। আকাশে মেঘের ক্ষণস্থায়ী সমাবেশ বা সমুদ্রসৈকতে ঢেউয়ের অপরিকল্পিত নক্‌সা রচনা আমাদের চোখে ভালো লাগে কেন? মানুষের আদিম সৌন্দর্যবোধের কাছে রঙ ও রেখার একটা প্রত্যক্ষ আবেদন রয়েছে বলেই। শিল্পীর হাতে পড়ে তা বিভিন্ন রূপ নেয় এবং স্বভাবতই তা রচয়িতার চিন্তা-ভাবাবেগের প্রকাশের বাহন হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতির খামখেয়ালে রচিত আলপনার অর্থহীনতার সঙ্গে মানুষের অঙ্কিত বিমূর্ত চিত্রের অর্থব্যঞ্জনার পার্থক্য এইখানেই।

মনে রাখা উচিত যে, ভাবপ্রকাশের একমাত্র মাধ্যম সাদৃশ্যরচনা বা কাহিনীবর্ণনা নাও হতে পারে। বিশেষ রঙের সন্নিবেশ, রেখার বিশেষ কোনো ছন্দ দর্শকের মনে বিভিন্ন সাড়া জাগায়। ছবিতে বিষয়বস্তুর চেয়েও বড়ো আসলে শিল্পীর বক্তব্য; নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুকে প্রয়োজনানুসারে কেটে-ছেঁটে এ বক্তব্য প্রকাশ করা হয়। সুতরাং অঙ্কনপদ্ধতির উপর অনেকখানি নির্ভর করছে এবং এ অঙ্কনপদ্ধতির মূল উপাদান রঙ ও রেখা। যে গাছপালা ইম্‌প্রেশনিস্ট, চিত্রে ছায়াশীতল শান্ত মাধুর্যের প্রতিরূপ, সেই গাছপালাই একটা উত্তপ্ত উন্মাদনার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে ভ্যান্‌গগের ছবিতে। তাই ছবির এই মৌলিক উপাদানগুলিকে বাস্তব থেকে অবচ্ছিন্ন করে বস্তু-নিরপেক্ষরূপে উপস্থাপিত করেও ভাব প্রকাশের দুঃসাহসিকতা সমর্থনযোগ্য।

গত শতাব্দীর শেষে বাস্তব বর্ণনার অঙ্কনপদ্ধতির নিঃসাড়তার বিরুদ্ধে সচেতনভাবে বিমূর্তিকরণকে আত্মপ্রতিষ্ঠার যাত্রাপথে উপস্থিত করা হয়েছিল। সেজান্ বস্তুজগতের অন্তর্নিহিত গঠনরীতিকে ত্রিমাত্রিক চিত্ররচনার মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করলেন এবং তার ধারা বেয়ে কিউবিজমের সূত্রপাত। অন্যদিকে ফোভিস্টদের ও জার্মান অভিব্যক্তিবাদের স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্ট রঙ ও রেখার সাবলীল সমাবেশে যার সূচনা হয়েছিল তার পরিণতি হলো ক্যান্‌ডিনস্কীর পরিপূর্ণ অবচ্ছিন্ন, বস্তু-নিরপেক্ষ চিত্ররচনায়।

এ ইতিহাসটা মনে রাখলে দেখা যাবে সোভিয়েত ইউনিয়নে বর্তমানে প্রচলিত বাস্তবানুকারী অঙ্কনপদ্ধতি বা কাহিনী বর্ণনার রীতিকে যেমন সমাজতন্ত্রের একচেটিয়া সম্পত্তি বলে দাবি করা যায় না, ঠিক তেমনই বিমূর্ত শিল্পকে বুর্জোয়া সমাজের অবক্ষয়ের অভিব্যক্তি বলে আক্রমণ করা চলে না। বাস্তবের সাদৃশ্য রচনার চল বহুকালাবধি ইউরোপের সর্বত্রই সর্বজনস্বীকৃত ছিল এবং তার সৃষ্টিকর্তা ও পৃষ্ঠপোষক উভয়েই ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত। আবার বিমূর্ত অঙ্কনপদ্ধতির আওতায় সৃষ্ট পিকাসোর ছবি কি সমাজতন্ত্রের আন্দোলনের অমূল্য সম্পদ নয়? কী বাস্তবানুকারী চিত্র, কী বিমূর্ত চিত্র—তার গুণাগুণ

নির্ভর করছে ভাবপ্রকাশের যোগ্যতার উপর, রচয়িতার মুন্শিয়ানার উপর। এ যোগ্যতা অবশ্যই অনুশীলনসাপেক্ষ।

সোভিয়েত ইউনিয়নে নূতন সভ্যতা সৃষ্টির যে বিরাট পরীক্ষা চলছে, সমগ্র জাতির যে দুঃসাহসিক অভিযান, তা নিয়ে রুশ চিত্রশিল্পীরা গত চল্লিশ বৎসরের উপর বহু ছবি এঁকেছেন। যৌথ খামারে কৃষকের ধানকাটার উৎসাহ, কারখানায় শ্রমিকের উৎপাদনবৃদ্ধির স্থির সংকল্প, ইত্যাদিকে নিখুঁত-ভাবে বর্ণনার মাধ্যমে এই যুগচেতনাকে প্রকাশের চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয়, সোভিয়েত জাতির কর্মপ্রচেষ্টাকে এর চেয়েও সার্থকভাবে অভিব্যক্ত করতে পেরেছে একটি ছবি। মস্কোতে বসে রবীন্দ্রনাথ ছবিটি এঁকেছিলেন। বহুল-প্রকাশের ফলে আশা করি অনেকের কাছেই সেটি সুপরিচিত। সাধারণ কালিতে আঁকা—রাত্রির অন্ধকার থেকে সদ্য-উত্থিত একটি মানুষের আলোর দিকে যাত্রার চিত্র। অ্যানাটমির নিয়মাবলী ছবিটিতে বেপরোয়াভাবে অস্বীকৃত হয়েছে, রঙের অনেকটাই অস্পষ্ট। কিন্তু সব মিলিয়ে একটা বিরাট জাতির মাথাচাড়া দিয়ে উঠবার এবং শত বাধা সত্ত্বেও এগিয়ে যাবার সংকল্পের অন্তর্নিহিত প্রকৃতিটা এমন অবিস্মরণীয় ভাবে আর কোথাও অঙ্কিত হতে দেখি নি।

সাম্যবাদ ও সংস্কৃতি

"Humanity's leap from the realm of necessity into the realm of freedom"—এই বলে এঙ্গেলস সাম্যবাদের বর্ণনা করেছিলেন। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি সাম্যবাদ গড়বার বিশ বৎসরের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। শ্রমবিভাগকরণ, কায়িক ও মানসিক শ্রমের ভেদ ইত্যাদি লোপ করে অর্থ-নৈতিক ভিত্তি প্রস্তুত করার দিকে এগিয়ে চলেছে। এই গতির সঙ্গে অসঙ্গত আজকের শিল্প-সাহিত্যের উপর রাষ্ট্রের সেই অতীতের জের টানা অভিভাবকত্ব। গত চল্লিশ বৎসর ধরে রুশ জনসাধারণ সমাজতান্ত্রিক ভাব-ধারায় সুশিক্ষিত হয়েছে বলেই আশা করি। শৈশবের অস্থিরতা কাটিয়ে কি তারা যৌবনের সুনিশ্চিত দায়িত্বজ্ঞানশীলতার স্তরে এসে পৌঁছয় নি? এখনও যদি তাদের সংস্কৃতির যাত্রাপথে শিল্পকর্মের পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি বা রাষ্ট্রযন্ত্রকে লাল ও সবুজবাতির সংকেত দিতে হয়, তাহলে দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে এ রীতি সেদেশের জনসাধারণের পরিণত চিন্তাশক্তির সবচেয়ে বড় অপমান।

পেলব আততায়ী ॥ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

তৃণ, আমায় অমন করে অবজ্ঞা কোরো না
(তুমি নিজেই একদা খুব অবজ্ঞাত ছিলে!)
কালকে যখন সারাটা রাত ঘরের বাইরে আমি
পথ হারিয়ে ঘুরেছিলাম তখন তোমার হাতে
নির্যাতিত নিগৃহীত হয়েছিলাম আরো;
আপাত ঐ নরম দাঁতে আমার প্রেমিক দেহ
টুকরো টুকরো করে তুমি রোমশ ক্ষিপ্র হাতে
সভ্যতা খুইয়ে মাঠে নগ্ন ফিরেছিলে
রক্তের স্বাদ উদ্‌যাপনে, এমন ভীষণ ক্ষণে
কৌম সরলতায় গাঁয়ের অগম-ওপার থেকে

কারুকাযের পিতল ঘটি বোকার মতো বয়ে
ফিরতেছিল দুলালী এক, শিকার করতে গিয়ে
নিজেই শিকার হয়েছে সে···আমায় দয়া করে
বলে উঠল, 'আমি তোমার বহিন্, ঘন রাতে
প্রতিপদের চন্দ্রকলার নম্র অসঙ্কোচে
আমি তোমার দেহের কাছে বহিন্ হতে পারি।'

তৃণ, তুমি সেই নারীকেও অবজ্ঞা করেছো,
অথবা সন্দেহ। তুমি নিজে নারীর মতো
সেবা করবে ভেবেছিলাম, কিন্তু নারীর মতো
তুমি আমার অর্জিত সেই পথের ভগিনীকে
টুকরো-টুকরো ছিঁড়ে-ছিঁড়ে পুরুষদের হাতে
এক-এক টুকরো দিলে যখন, তখন থেকে আমি
নারীর বুকের দুটি সত্তা বুঝতে পেরে গেছি॥

কোথাও কথনও একা নই ॥ শিবশম্ভু পাল

নক্ষত্রপ্রতিম যদি, এখানে এসো না।
এখানে আমরা হাসছি লক্ষবার প্রতারিত হয়ে
কোথায় লুকোয় তারা ব্যর্থকাম প্রতারক—সম্ভবত ক্ষণ-বিস্মরণে।
এখানে আমরা সব উৎসবের দুর্দান্ত মেজাজে।

স্বাতন্ত্র্য নতুন কথা নয় ; লিপি যথা মুখ যথা
মানুষের বাড়ি যথা, স্বাতন্ত্র্য তেমনি অনুপম
এবং এমন অর্থে আমরাও বন্ধুহীন নক্ষত্রপ্রতিম !
তবুও প্রত্যেকে বাঁধা উৎসবের চেতনায়, আর
উৎসব কখনো মরে না।

উৎসব মেলার মধ্যে, পূজায় সভায় ঘরে এবং বাহিরে
উৎসব রক্তের মধ্যে হৃদয়ের আদানে প্রদানে
বাৎসল্যে উদ্বেগে আর প্রবাসী বন্ধুর লেফাফায়
উৎসব নতুন লেখা কবিতার সজীব অক্ষরে···।

বরং মর গে যাও, বৃন্তচ্যুত, অন্ধকারে আনাচে কানাচে
যেখানে মশার জন্ম, মাছিদের লীলাক্ষেত্র, যাও,
ভাঁটিখানাবিতাড়িত স্বাতন্ত্র্যবিলাসী, ড্রেনে, অথবা, ফুটপাথে
অথবা পাঁজরা চেপে রক্তের বমনে যাও নরকে তোমার।

এখানে আমরা কেউ কোথাও কখনো একা নই ॥

জয়জয়ন্তীর সূর্য ॥ চিন্ময় গুহঠাকুরতা

(এক : সঙ্কল্প)

প্রত্যেকেই শাস্ত্রবাহী, রণাঙ্গনে কৃষিক্ষেত্রে ঘরে
প্রস্তুত অযুত বক্ষে শেষ রক্তবিন্দু অবিচল
অটুট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ প্রতিরোধে, দ্বিতীয়বাহিনী ;
প্রস্তরের ভিত টলে ; স্থাণু স্থৈর্যে নেমে আসে চল।

আমরা প্রত্যেকে দক্ষ শ্রমজীবী ; বক্ষে জ্বলে সহস্র ফার্নেসে
উৎপাদক সৃষ্টিবহ্নি ; অস্ত্রসজ্জা কাস্তে বা তুর্পুন
হাতে হাতে শস্য ওঠে, শিল্প গড়ে ওঠে এই দেশে
অত্যন্ত সৃজনশীল জলবায়ু, বিদ্যুৎ বাহিনী।

(দুই : চেতনা)

যুদ্ধ আমরা কাকে বলি ? দুই পক্ষে হতাহত সহস্র সৈনিক
আর্তনাদে ফেটে যায় চতুর্দিক, যেমন দুর্বল বুকে যক্ষ্মার বীজাণু
পরস্পর যুদ্ধ করে রক্ত আর শ্বেত কণিকারা
অস্থির সংগ্রাম শেষে মৃত্যুর গোপন ক্লান্তি নেমে আসে ঠিক।

(তিন : আকাঙ্ক্ষা)

এই যুদ্ধ থেমে যাবে একদিন। পৃথিবীর সব যুদ্ধ সেইদিন
শান্ত হয়ে যাবে

আজকের রক্তপায়ী বীরবৃন্দ অন্যতর স্থায়ী প্রতিযোগিতার
অতি স্বাস্থ্যকর যুদ্ধে মেতে উঠবে ; দৃঢ়সন্নিবদ্ধ মাংসপেশী
সৃজনে অভ্যস্ত হবে ; সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জে সৃষ্টি হবে শক্তির জোয়ার।

যেখানে দেয়াল ছিল চতুর্দিকে হিংস্র এক প্রচণ্ড পাহারা
আলোকরশ্মির স্রোতে ভেসে যাবে অকস্মাৎ, মহামৃত্যুঞ্জয়
সপ্তাশ্ববাহিত রথ শব্দ করে থেমে যাবে সমতল প্রশস্ত অঙ্গনে
সংবাদপত্রের ভাষ্য হয়ে উঠবে তীব্র উচ্চস্বর :

জানি, স্থির সূর্য উঠবে সেইদিন ; বরাভয়ে দীপ্ত জ্যোতির্ময় ॥

শিকারের গল্প ॥ মণিভূষণ ভট্টাচার্য

পাঁচ বার ঘুরে ফিরে, ঘুরে ফিরে ঠিক পাঁচ বার
গিলে ফেললো বিস্কুটের টোপ
যথোচিত পরাক্রমে অর্থহীন লম্ফঝম্প তার
টোপের ভিতরে ছিলো বঁড়শির প্রকোপ।

পুকুরের সবচেয়ে নামজাদা প্রবীণ রোহিত
মৎস্যের মোড়ল, তার পরিপক্ক রঙের বাহার
সূর্যাস্তে ঘোষিত। কিন্তু দুর্বিপাক ওৎ পেতে ছিলো—
কশ বেয়ে দামী রক্ত সকাতরে মিশে গেলো জলে।

মহিলা কাৎলার সঙ্গে ভর দুপুরে খানিক মস্করা
জমেছিলো। মজে যেতে পারতো তার প্রৌঢ় শরীর
মৎসীর শরীর পেলে। দুষমন পেছনে লেগেছিলো,
নতুবা কেন সে এলো সুগন্ধি-ভরপুর সন্ধ্যেবেলা
শয়তানের পাতা চারে, নয়নের পাতা ফাঁদে তার
ইহকাল পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেলো। কেন
মজবুত জলের স্রোত লাল হয়, ঝাপসা চোখে তার
প্রতিবেশিনীর দেহ ততোধিক ঝাপসা মনে হয়।

ক্রমশ বমির মতো উপদ্রব বুকের ভিতরে,
কে যেন যে কোনো দিকে টেনে নিচ্ছে সমস্ত মগজ,
কেবা এক জলে ফেলে তুলে নেয় জলের সংসার,
কানের দু-পাশ দিয়ে ঘুরন্ত জলের স্রোত, রক্তধারা বয়—
ঘুরপাক খেতে খেতে ঘুরপাক খেতে খেতে ঘুরপাক···
ভেসে উঠলো সনির্বন্ধ জলের উপরে।

গত রাত্রে ধরণীর নগরে নগরে
মুড়িঘণ্ট ঘটেছিলো মানুষের ঘরে।

বন্ধুগণ, ভদ্রলোককে বলতে দিন ॥ গোবিন্দ গোস্বামী

নিষিদ্ধ ফলের লোভে স্বর্গচ্যুত হয়ে গেছি ঠিক—
আরে দূর, সব ফাঁকি! বলে সেই শান্ত ভদ্রলোক—
অশ্রাব্য ভাষায় কিছু বলেছেন নির্বিঘ্নে যাহোক;
কোন্ নারী সতী-সাধ্বী? অলঙ্কার নিছক আধিক!

বিনম্রী দেখেছি ঢের; রুচিশীল আমরা সবাই।
আহা, গোবেচারা সুধী চিরকাল তথাগতপ্রাণ
পুরু কাচ ঘষে নিয়ে বক্রচোখে যেদিকে তাকান
বিশুদ্ধ সে পদাবলী—দেখা শেখা জীবনে, মশাই।

চিহ্নিত ইষ্টের নাম, ভক্ত যার ঔদার্যে প্রাচীন,
অথচ নির্বাক গুরু আত্মহত্যা দেখেছেন স্ত্রীর;
লোকনিন্দা! কোন্ যুগে ভদ্রকেরা চরিতে সুস্থির?
ঈর্ষার নির্লজ্জ ক্ষোভে নীতিশাস্ত্র বিবেকবিহীন।

উন্মার্গগামীর ঠোঁট ভণ্ডামির নব সংকীর্তনে
মোহান্তের ধরা-চুড়া ফোঁটা কেটে নামাবলী গায়
সুললিত ধুয়ো টানে: ত্যাগ করো উন্মুক্ত দ্বিধায়।
পুরনারী বিমোহিত, ভক্তজন মূর্ছিত চরণে ॥

একটি প্রার্থনা ॥ যতীন্দ্রনাথ পাল

তবে চলে যেতে দাও দিগন্তরেখার ওধারে—
রোদ্দুরগুলোকে।
চলে যেতে দাও।
মাঠের ওপর থেকে রোদ্দুরগুলো চলে যাক,
তাড়াতাড়ি,
দ্রুত পা ফেলে-ফেলে;

সূর্য একমাসে
পরিক্রান্ত হোক।
বৃক্ষরাজি আকাশতলে
তাড়াতাড়ি
নিশ্চিহ্ন হতে থাকবে,
কত স্তন্যদাত্রী—নির্মলা নদী—
বিলুপ্ত হবে,—
আর
দাম্ভিক, অযুত মজ্জাগ্রাসী
মহাপাপী সভ্যতা
চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে,—

অশ্রু-আকীর্ণ দিগন্তরেখার ওধারে
দিনগুলো চলে যাক—
বেদনা প্রলম্বিত করতে
ওদের থাকতে বলো না
তোমাদের হাড় পৃথিবীতে হারাবার ভয়ে।

একটি অভূতপূর্ব সভ্যতা আছে—
বহুদূর শুভ-সময়ে ॥

দাক্ষিণাত্যে ॥ জিষ্ণু দে

তামাকের পাতা লাল হয়ে এলো আজ
দূরে পাহাড়েরা আজও কুয়াশায় ভরা
দুঃখের নদী মোহানার দিকে ছোটে,
তোমার প্রাণেই রূপসী বসুন্ধরা।

অচেনা ফসল টুকরো টুকরো জমি
সূর্যের প্রেমে ভাস্বর এই দেশ।
প্রেমিকের চোখ ক্লান্ত নয়তো আজও
গরীবের আজও প্রতীক্ষা নয় শেষ।

তোমাকে চিনি না তবুও হে সুন্দরী
প্রেমের তুফানে সাগরের পরিচয়।
এ বিস্তার তো তোমার আমার দেশ,
হাজার মাইলে সবই চেনা মনে হয়।

হুজুর বাহাদুর ॥ রণজিৎ সিংহ

হুজুর বাহাদুর, যাজ্ঞা করি কণামাত্র করুণার।
সুপারিশ করুন,
যেন পাই রুজির ফরমান।
ছা বৌয়ের মুখে ফোটাব হাসি
চালে তুলব নতুন খড়।

হুজুর বাহাদুর মালিক আমার,
ইদানীং হৃতপ্রাণ হতবল জরদ্গব
রাজী আছি—দেবো নাকে টানা খত।
কসুর করুন মাফ ;
রক্তের তেজে হয়েছিলাম বেচাল
পা ফস্কে নেহাৎই জুটেছিলাম আগুনের কারখানায়
বারুদের মালিকানায় আনচান।

তোবা তোবা
ভুখা নাঙ্গার জোটে কে আর যায়!

দেখে ঠেকে সমঝেছি এবার
মগজের হঠাৎ আলোয় সমঝেছি এবার ;
আপন বাঁচাই সার
স্ত্রী পুত্র সংসার সত্য
ইয়ার দোস্ত তত্ত্ব তর্ক অন্তিমে কোন ছার—
এই বোধি এই দিব্যজ্ঞান।

হুজুর বাহাদুর,
অধীন নয় কাতর
লিখে দেবো আত্মশুদ্ধির পবিত্র দাসখত।
নই বেইমান
নিত্য জোগাব নয়া শত্রুর লোভনীয় সমাচার।
নই নিমকহারাম
বাজারে বৈঠকে রটাব অপার প্রশস্তি
জান যায় যাবে ওই পদযুগ সেবায়।

কিন্তু হুজুর বাহাদুর মালিক আমার,
শেষ আর্জি এই :
যেন ভবিষ্যৎ বাঁধা থাকে ;
যেন বেঁকে না বসে
বিনয় নীতি কর্মজ্ঞান বিষয়ে দীর্ঘ সাক্ষ্য লেখে ইতিহাস।

গোলাপ হয়ে উঠবে

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

মাঝরাতে সুব্রতর ঘুম ভেঙে গেল।

অচেনা জায়গায় ঘুম তার এমনি ভেঙে যায়। গভীর ভাবে ঘুমোতে অবশ্য সে কোনোদিন পারে না, কিন্তু একান্ত ব্যক্তিগত সেই হালকা ঘুমটুকুর জন্যেও তার দরকার সেই নিজের ছোট ঘরখানা। সেখানে জানলায় জামগাছ সারারাত ছায়া বুলোয়। জামগাছের পিছনে সারারাত মফঃস্বলের মিউনিসিপ্যালিটির বিদ্যুতের বাতি জ্বলে। হাওয়ায় হাওয়ায় জামগাছের সরু সরু ডালগুলো কখনো সরে যায়, কখনো আলোটা মুখে হাত ঢাকা দেওয়ার ভান করে। সেই ঘরের ভেতরের দেওয়ালে সব জায়গায় পলস্তারা নেই। মাঝে মাঝে খসে গেছে। বাইরে থেকে বিদ্যুতের আলো না চাইতেও ঘরে ঢোকে। ঘুম না এলে যে জায়গায় পলস্তারা নেই সে জায়গার ইটের সংখ্যা গুণত সুব্রত। উনষাট কিংবা উনসত্তর খানা লালচে ইট গুনতে গুনতে কোনো কোনোদিন ঘুম আসত। সুব্রতর ছোট ভাই প্রিয়ব্রত, আর প্রিয়ব্রতর সঙ্গে পড়ত, এখন বৌ, নন্দিনী পাশের ঘরে গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ত। সুব্রত বুঝতে পারত। মফঃস্বলের ছোটগলির পল্লী এগারোটার পরেই নিঝুম হয়ে যায়। প্রিয়ব্রত আর নন্দিনী ঘুমিয়ে পড়লে এ বাড়িতে শুধু শোনা যেত ওর মায়ের হাঁপানির কাসির শব্দ। মাঝে মাঝে এক একদিন মাঝরাতে সুব্রতর এমনি অকারণেই ঘুম ভেঙে যেত। মায়ের কাসির শব্দ শুনে আবার নিশ্চিন্ত মনে পাশ ফিরে ও ঘুমোতে চেষ্টা করত। এক দুই তিন করে মায়ের কাসিও গুনে ফেলতে চাইত সুব্রত। এতেও কোনো কোনো দিন ঘুম আসত।

আজ এখানে মাঝরাতে সুব্রতর ঘুম ভেঙে গেল।

তাদের শহরটা এই উদ্বাস্তু কলোনি থেকে এমন কিছু দূরে নয়। রেললাইনের হিসেব ধরলে দুটো স্টেশন পরে। কিন্তু এখন তার কাছে

অগম্য। আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে আসার পর সে শ্যামনগর গেছে বটে দু-তিনবার। কিন্তু রাত্রে গেছে, রাত্রেই ফিরে এসেছে। এবং একবারও নিজেদের বাড়িটায় যেতে পারে নি। নিজের ঘরখানাতেও না। এখানে ওদের বন্ধু প্রকাশদার বাড়িটা এখন ওর আস্তানা। যতক্ষণ না ওপর থেকে নির্দেশ আসে ততক্ষণ এখানেই থাকতে হবে। প্রকাশদা প্রৌঢ়। রোগা। লম্বা। প্রকাশদার বৌ সুনয়নী সবসময় ক্লান্ত। মেয়ের নাম রুচি। সুব্রতর মেয়েটিকে ভাল লাগেনি। বড় বেশি কথা বলে। প্রকাশদা এখানে একটা স্কুলে মাস্টারি করে। সেই স্কুলেই সকালে মেয়েদের বিভাগে রুচি পড়ায়। দু-দিন হলো সুব্রত এখানে এসেছে। দু-রাত্রি এ বাড়িতে সে কাটাল। মস্ত বড়ো পুরনো বাড়ি। ভেঙে ভেঙে পড়ছে। কোণের দিকে খানতিনেক ঘরে প্রকাশদার গেরস্থালি। চারদিকের ভাঙা ঘরদোর জানলার সঙ্গে মিলিয়ে প্রকাশদার গেরস্থালির দিকে তাকালে মনে হয় যেন সব ঘরের দাবি এক এক করে ছাড়তে ছাড়তে প্রকাশদা এই শেষ তিনখানা ঘরে এসে ঠেকেছে। এই তিনখানা ঘর সদর দরজার কাছ ঘেঁষে। এর পরেই বড়ো রাস্তা। রাস্তার ওপারে একফালি মাঠ। তারপরেই নতুন নগর উদ্বাস্তু কলোনি।

ঘুম ভেঙে গেল সুব্রতর। কত তারিখ আজ, এগারোই নভেম্বর, না বারোই, উনিশ শো উনপঞ্চাশ সাল।

এখন কত রাত? অনেক হবে নিশ্চয়। ঘুম ভাঙতেই অভ্যেসমতো মায়ের কাসির শব্দের জন্য কান পাতল সুব্রত। কে একজন কাসছে বটে। মা নয়। উঠে পড়ল সুব্রত। আকাশে কোথাও বোধহয় একটুখানি চাঁদ আছে। এদিকে রাস্তায় আলো জ্বলে না। মেটে মেটে আলোয় শির শির করছে কার্তিকের রাত। যে লোকটা কাসছে, সে রাস্তার উল্টো দিকে কাঁচা নর্দমার ওপর ঝুঁকে পড়ে বুক চেপে ধরে কাসছে। ভেতরের দিকে দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। 'মা' বলে রুচি ডাকল। এখন প্রিয়ব্রত আর নন্দিনী বোধহয় অকাতরে ঘুমোচ্ছে। আর মা বুকে বালিশ চেপে ধরে জেগে জেগে হাঁফাচ্ছে। চিন্তাটা এই আকার ধারণ করতে সুব্রত একটু সতর্ক হলো। না। মায়ের হাঁফানো ছাড়া উপায় নেই। মা আর সারবে না। প্রিয়ব্রতরা সারাদিন খাটাখাটনি করে। না ঘুমিয়ে পড়ে ওরাও পেরে উঠবে না। যে লোকটা কাসছিল সে কাঁচা নর্দমাটা পেরিয়ে ওদিকের মাঠের ওপর গিয়ে উঠল। তারপর কে জানে কাদের একরাশ হোগলার গাদার ওপর

বসে বসে কাসতে লাগল। লোকটা আই-বির লোক হতে পারে। আবার অন্ধকার কেটে গেলে দেখা যেতে পারে যে লোকটা পার্টির ওপরমহলের পাঠানো কুরিয়ার। এটাকে ওটা ভাবার এবং ওটাকে এটা ভাবার অভিজ্ঞতা সুব্রতর আছে। কাজেই সে চঞ্চল না হয়ে চুপ করে জানলার ধার থেকে সরে এল। কুরিয়ারদের নির্দেশ দেওয়া থাকত রাত্রে নক্ করবে না। কর্মীদেরও জানা আছে রাত্রে কুরিয়ার জানলেও আচমকা সাড়া দেবে না। বীরভূমের ডিষ্ট্রিক্ট লেভেলের তিনজন ধরা পড়ল শুধু এই ভুলটুকুর জন্য। সুতরাং ও যেই হোক ওকে অপেক্ষা করতে হবে সকাল পর্যন্ত। একটা সিগারেট ধরাল সুব্রত। দিন আসছে সামনে। দিন, সূর্যালোক এসব কথা ভাবলেই বিরক্ত হয়ে পড়ে সে। দিন মানে এই জানলাটা বন্ধ করতে হবে। নিঃসাড়ে পড়ে থাকা। মন্থর এবং ক্লান্ত প্রকাশদার স্ত্রী মাঝে মাঝে ঘরে এসে দাঁড়াবে। প্রকাশদা মাথায় তেল বুলোতে বুলোতে দেশের হালচাল জিজ্ঞাসা করবে। প্রকাশদার মেয়ে রুচি মোটা মোটা তুলোর পুঁটলি দিয়ে লাল লাল পোষ্টার লিখবে। আর সমানে বক বক করবে। দিন মানে, সুব্রত ঘরের মধ্যে পাইচারি করবে। সিগারেটের টুকরো ছিটোবে। মাঝে মাঝে রুচি এসে দাঁড়াবে বিবর্ণ চায়ের গ্লাস নিয়ে। এসেনবেরিতে লক আউট, কাকদ্বীপের সংঘর্ষ, সিঙ্গুরে কৃষক হাঙ্গামা—সারাদিন রুচি শুধু এক খবর থেকে আর এক খবরের উত্তাপে টগবগ করবে। আর সুব্রতকে জ্বালাতন করবে। মেয়েরা পারে কি না পারে বৌবাজারে দেখিয়ে দিয়েছি।

আজ সাতদিন জেলার সঙ্গে কোনো যোগ নেই। সাতদিন আগে সেই যে রবিবার শেষরাত্রে হাজিনগরের ডেন্ থেকে পালাতে গিয়ে সুরজিতের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হলো সঙ্গে সঙ্গে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। সুরজিৎ কোথায় গেল কোনো খবর করতেই পারল না। বাহাত্তর ঘণ্টা সে গৌরীপুরের পাচনম্বর কুলি লাইনের এক জায়গায় কাটিয়েছে। কিন্তু চতুর্থ দিনে ভোররাত্রে সে যেখানে ছিল সেখান থেকে পঞ্চাশ হাত দূরে রাউণ্ড-আপ হয়। সুব্রত জানত না পি-সির একজন নেতা ওখানেই শেল্টার নিয়েছিলেন। বিরাট কালো প্রিজন ভ্যানটা চলে যাবার পর সুব্রত নৈহাটি স্টেশনে এসে গাড়ি ধরে। এখানে প্রকাশদার বাড়িতে সে আগে একবার থেকে গেছে। জায়গাটা নিরাপদ। কিন্তু কদিন ধরে কোনোদিকে কারো সঙ্গেই কনট্যাক্ট্ করে উঠতে পারছে না। কেমন যেন দলছাড়া হয়ে হাঁফিয়ে উঠেছে। অন্ধকারে

হাতড়ে হাতড়ে মোমবাতির টুকরোটা জ্বালাল। মোটা বইখানার ওপর টুকরো মোমবাতিটা রাখল স্বব্রত। এইটা আসলে রুচির ঘর। এখন ও রয়েছে বলে ওকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে। একটা দড়ির আলনায় রুচির কতকগুলো কাপড়। একটা কুলুঙ্গিতে কতকগুলো বই। স্বব্রত চিঠি লিখবে ভেবে বাতি জ্বালিয়ে বসে রইল। কী ভেবে চিঠি লিখল না। বাতির শিখাটা হেলবে দুলবে তাই দেখবে ভাবল। সেই অস্থির আলো সহসা গিয়ে পড়ল দেওয়াল টাঙানো একটা ছবির ওপর। মাঝরাতের একটু পরে নির্জন ঘরের বিবর্ণ দেওয়ালের সেই ছবির মানুষটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে স্বব্রতর ইচ্ছে করল একটু ঘুমিয়ে নেয়। আধো ঘুমের মধ্যে সে শুনতে লাগল বাইরের সেই লোকটা যে কুরিয়ার হতে পারে বা আই-বির লোক হতে পারে, কাসতে লাগল আর শ্লেষ্মা তুলতে লাগল। লোকটা যে কেউ হতে পারে। হোক। যাই হোক ওকে তার কাছেই আসতে হবে। শুধু শেষরাতের ওয়াস্তা। ওর তন্দ্রায় কাসির শব্দটা মিলিয়ে গেল। অনেক—বড়ো হয়ে হয়ে শেষে যেন আকাশে গিয়ে ঠেকল সেই দেওয়ালের ছবির মানুষের মুখটা।

মুখটা জোসেফ স্তালিনের!

মৃদু তন্দ্রা ছোট্ট পাখির মতো দ্রুত উড়ে গেল। ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে গেল সেই মানুষের ছবিটা।

কে যেন খুট্‌খুট্ করে ভেতরের দরজায় শব্দ করছে। স্বব্রতর নাম ধরে ডাকছে। প্রকাশদার গলা। স্বব্রত উঠে দরজা খুলে দিল। একটা বিছানা-ঢাকা সুজনি জড়িয়ে প্রকাশদা ঘরের মধ্যে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল।

—কে ও লোকটা?

—বুঝতে পারছি না।

—অনেকক্ষণ থেকে বসে আছে।

—যদি এখানে এসে থাকে তো এইবার আসবে। আলো জ্বালাব?

—না, থাক। কাল রাত্রে আর তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারি নি।

—কোনো খবর আছে?

—তোমাকে দেবার খবর কেউ দেয় নি। আমি শুনলাম একটা খবর। রমেন? কেমন ফিস্ ফিস্ করে উঠল প্রকাশদা।

—হ্যাঁ, কী হয়েছে?

—পরশু পুলিশ হাসপাতালে মারা গেছে।

—কার কাছে শুনলেন?

—রমেনের দাদা ভূমেন, সেই সনাক্ত করেছে। মাথায় আর কিডনিতে গুলি লাগে। হাজিনগরে কোনো একটা ডেন্ থেকে পালাতে গিয়েছিল। ওর সঙ্গে যে ছিল সে ছেলেটা কেটে বেরিয়ে যায়। ওকে প্রিজন ভ্যানে তোলে। ও প্রিজন ভ্যান থেকে লাফিয়ে পড়ে। ছুটছিল। সেই অবস্থায় গুলি লাগে।

মশারিটা গুটিয়ে চৌকির ওপর বসে পড়ল স্বব্রত। রমেনের নামই স্বরজিৎ। এখন পার্টির ওপরে নিচে সবাই ওকে স্বরজিৎ বলেই জানে। একসঙ্গে ছিল ওরা। এই সাতদিন সে রমেনের কথাই ভেবেছে। তার কেমন দৃঢ় ধারনা হয়েছিল যে রমেন—না স্বরজিৎ—না রমেন, ঠিক কেটে বেরিয়ে যাবে। মনে মনেও এ কদিন রমেন বলেনি স্বব্রত। স্বরজিৎ বলেছে। এখন আর গোপনতা কেন? এখন কি স্বরজিৎ না রমেন? নাকি কিছুই নয়—নাম মাত্রই আর নয়। রমেনও নয় স্বরজিৎও নয়।

—ওর দাদা খুব মুষড়ে পড়েছে।

—কার?

—রমেনের।

—(স্বরজিতের।)

—ভাইটার ওপর খুব ভরসা করেছিল। পর পর তিন বোন, নাবালক ছুটো ভাই। বড়ো সংসার তো?

—মরবার সময় জ্ঞান ছিল?

—টন্‌টনে জ্ঞান ছিল। দাদাকে দেখে প্রথমটা যেন চিনতেই পারে না। পুলিশের ডাক্তার ওর দাদাকে আড়ালে বলে যে নামঠিকানা কিস্যু দেয়নি। ওর কাছে কাগজপত্র পাওয়া গেছে তাই দেখে পুলিশ ভূমেনকে খবর দেয়। ভূমেনকে দেখে রমেন—

—(না স্বরজিৎ)

—সটান হাঁকিয়ে দেয়, আপনাকে চিনি না আমি, কে কার দাদা, বাড়ি যান। সেইটা ভূমেনের খুব মনে লেগেছে। ও ভাবছে যে বকতঝকত এ সব হাঙ্গামার জন্যে সেই অভিমানে বুঝি রমেন ওকে চিনতে চাইল না। আসলে তো ব্যাপারটা তা নয়। বুঝতেই পারছ।

স্বব্রত চুপ করে বসে রইল। তাহলে রমেন মানে স্বরজিত কাগজপত্র

আর চিঠির প্যাকেট সমেতই ধরা পড়েছে এবং তাহলে প্রাদেশিক কমিটিকে লেখা সুব্রতর চিঠিগুলোও পুলিশের হাতেই পড়েছে! আর কিছু নয়, শুধু অনেকগুলো নাম পেয়ে যাবে পুলিশ। আর তার সম্বন্ধে অনেক কিছু।

—তুমি কিছু খবর পাও নি?

—না।

—রমেনের সঙ্গে তোমার শেষ দেখা হয়েছে কবে?

কোনো জবাব দিল না সুব্রত। বোঝাই যাচ্ছে প্রকাশদা বিচলিত হয়েছেন খুব। তা নইলে যে কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত নয় তিনি সে কথা জিজ্ঞাসা করবেন কেন। সুব্রত আবার মুখটা ঘুরিয়ে নিল সেই মানুষটার গম্ভীর প্রশান্ত মুখের দিকে। আজারবৈজানের টম্যাটো, বেইলোরুশিয়ার আলু, তুর্কমেনিস্তানের খুবানি…কত দীর্ঘ, চড়াই উৎরাই ভাঙলে তবে পৌছনো যায়? ঘরের মধ্যে আলো ঢুকছে এসে। ভোর হয়ে আসছে। ভোরের এরোপ্লেন দমদমের দিকে উড়ে গেল। একটা ভাঙা স্টোভের গর্জন শোনা গেল বাড়ির মধ্যে। রুচি চা করবে এবার—অনেকখানি হেঁটে যেতে হবে ওকে। ও তাই এখন থেকে প্রস্তুত হয়। ভোরের প্রথম ম্লান আলোটা বাঁকা হয়ে সেই ছবিটার ওপর পড়ছে। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সুব্রতও লক্ষ্য করল ছবিটাকে পোকায় কাটছে। সময় নিঃশব্দে বয়ে চলেছে। কুর কুর শব্দে সেই সময়ের হাত যেন ছবিটাকে কাটছে। তার হাতে ক্ষয়ে যাচ্ছে ছবির মানুষটা কিন্তু আশ্চর্য প্রশান্তিতে স্থির।

—মুস্কিল হয়েছে কী জান সুব্রত, কাউকে বলা যাচ্ছে না। ওর বুড়ো বাবা কিছুই জানেন না। রমেন কোথাও পার্টির কাজে গেছে—এই জানেন তিনি। প্যারালিসিসে বাঁ দিকটা পড়ে গেছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঠিক বুঝতে পারছেন কিন্তু, যে কিছু একটা হয়েছে। তিনি কেবলই জিজ্ঞাসা করছেন, ও ভূমেন অত ছোটাছুটি করছিস কেন রে? উনি মনে করছেন যে, রমেন বোধ হয় পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। কেবলই বলছেন, আহা বল্ না আমাকে, ধরা পড়েছে তো, সে আর লুকনোর কী আছে। কিন্তু সত্যিই বলা তো যায় না। ওরা ডেড্‌বডি নেয় নি…

সেখানে ট্যাঙ্কের শব্দ স্তব্ধ হলে নিয়ে আসে ট্রাক্টরের দিন, জোসেফ—কার লেখা, সমর সেনের? পোকার কির কির শব্দটা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল।

একটা আশ্চর্য চটুল চড়ুই প্রথম কিচ্ করে ডেকে উঠল। তাহলে সকাল। স্টোভের আওয়াজটা হঠাৎ দম-আটকানোর মতো থেমে গেল।

—সেটা আবার এক হিসাবে এ বাড়ির পক্ষেও ভালো হয়েছে।

—কেন?

একটু গলা খাঁকারি দিলেন প্রকাশদা। স্টোভটা খারাপ হয়ে গেছে নাকি। পোকার দিয়ে পরিষ্কার করছে রুচি?

—রুচি খুব শক্‌ড হবে।

—মানে?

—তুমি কিছু জানতে না?

—না তো।

—রুচির মাও ভেঙে পড়বেন। উনিও খুব আশা করেছিলেন।

আর বসে থাকতে পারল না সুব্রত। উঠে বাইরের জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সুরজিৎ নয়, রমেনের মৃত্যুসংবাদই সে শুনল এবার। কে লোকটা বাইরে রয়েছে, কুরিয়ার না আই-বির লোক—এবার সে এগিয়ে আসুক। কার্তিকের শীত শীত সকালে মাঠের হোগলার ওপর শুয়ে শুয়ে যে লোকটা কখনো কাসছিল, কখনো ঢুলছিল, সেও এইবার উঠে বসল। গলার আর মাথার কম্ফর্টারটা খুলে ফেলতে ফেলতে সে কাঁচা নর্দমা পেরিয়ে এ বাড়ির দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। লোকটা জানলার দিকে এগিয়ে এসেই গোঁফদাড়ির আড়াল থেকে একবার হাসল। চিনতে পারল সুব্রত। জেলা পার্টির কুরিয়ার। ওর নাম বিনয়। আসল নাম কী কে জানে।

—খুলুন, চিঠি চাপাটি আছে। কখন থেকে এসে জমে গেছি।

লোকটার দাড়িতে একটুকরো হোগলার আঁশ লেগে রয়েছে। চোখদুটো লালচে। গলার স্বর ভারী ভারী। ময়লা কাঁধ-ছেঁড়া শার্ট। ধুতি আর কাবলী চপ্পল ধুলোয় বোঝাই। প্রকাশদা উঠে ঘরের বাইরে যাবার জন্য পা বাড়ালেন। লোকটা বলল—বসুন, আপনারও খবর আছে। প্রকাশদা বললেন—একটু চায়ের জন্য বলে দিই। প্রকাশদা বাইরে যেতে সুব্রতর দিকে তাকিয়ে লোকটা একটু রূঢ় কণ্ঠে শুরু করল—আপনি যে কাদের কাছে ইউ-জি, পুলিশের কাছে না পার্টির কাছে আপনার ব্যবহারে তা স্পষ্ট নয়। এখানে কবে এসেছেন?

—বুধবার।

—আর আজ শনিবার। যে সব ডেনে, শেন্টারে আপনার থাকা সম্ভব তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি, এ্যাও নো পাত্তা। একটা কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টাও করেন নি। খবর সব জানেন?

—সুরজিৎ?

—হ্যাঁ, এ্যাণ্ড এভরিথিং ইজ ইন দি হ্যাণ্ড অব্ দি পুলিশ।

নিচু গলায় উত্তেজিত স্বরে লোকটি কথা বলে যেতে লাগল। লোকটি উঠল, জানলার কাছে গিয়ে গলার কফ পরিষ্কার করল, আবার এসে বসল। 'একটা সিগারেট খাওয়ান'। 'আমার সেই পুরনো অ্যালার্জির সর্দি আবার চেপে ধরেছে'। 'কই, প্রকাশদা চা হলো'। এসবের মাঝে মাঝে মিশে যাচ্ছিল 'জোলিও কুরি বলবেন বোধহয়'। 'হ্যাঁ ময়দানেই র‍্যালি হবে'। 'দেখবেন আপনি যেন মিটিং-এ যেতে গিয়ে আবার গেঁথে যাবেন না'। 'এই নিন চিঠি'। দু ইঞ্চি চওড়া, তিন ইঞ্চি লম্বা খামটা হাতে নিল সুব্রত। ছিঁড়ল। পার্টি তাকে জানাচ্ছে যে অনতিবিলম্বে সে যেন এ স্থান ত্যাগ করে। তার কতকগুলো কার্যকলাপ সম্বন্ধে পার্টির বিস্তর জিজ্ঞাসাবাদ আছে। আজ বেলা দশটার সময়ে সে যেন নৈহাটি স্টেশনের সামনের চায়ের দোকানে শেখরের জন্য অপেক্ষা করে। শেখর তাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবে। পড়ে চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলল সুব্রত।

—তাহলে তো উঠতে হয়।

—আমি আগে চলে যাই, দাঁড়ান।

লোকটি উঠে প্রকাশদার কাছে গেল। নিচু স্বরে কী সব কথা বলতে লাগল। প্রকাশদা গম্ভীর হয়ে শুনতে লাগলেন। হুঁ আর না-এর মাঝামাঝি ঘাড় নাড়তে নাড়তে একসময় প্রকাশদার কথা শোনা শেষ হয়ে গেল। স্টোভের আওয়াজ থেমেছে। পাখিগুলোর ডাক শোনা যাচ্ছে। রুচি নতুন লোকটিকে কী সব কথা জিজ্ঞাসা করে চলেছে। লোকটি পাশ কাটানো জবাব দিচ্ছে। চা খেতে খেতে পেয়ালা হাতে নিয়ে রুচি একবার সুব্রতর ঘরে ঢুকল। সেই ফাঁকে লোকটি প্রকাশদার কাছে বিদায় নিল। রুচি জিজ্ঞাসা করল সুব্রতকে—

—আপনি কি এখনি চলে যাবেন?

—তাই তো মনে হচ্ছে।

—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

—নিশ্চয়।

—কী হয়েছে? থম থম করছে রুচির মুখ। বেশী কথা বলতে যেন কষ্ট হচ্ছে ওর।

—কোথায়, কার?

—কোথাও, কারো একটা কিছু হয়েছে।

—আমি কিছু জানি না, রুচি।

চায়ের পেয়ালাটা ঠোঁটের কাছে তুলতে গিয়ে আবার নামিয়ে আনল সে।

—আপনার সঙ্গে রমেনদার দেখা হয়।

—এর আগে তো কয়েকবার হয়েছে।

—এবার যদি দেখা হয় বলবেন তো এদিকে এলে যেন আসে। পুলোভারটা হয়ে গেছে।

—বলব। কথাটা বলেই সুব্রতর মনে হলো যেন সে নিজে বড় অসৎ।

—সুরজিৎ কে?

চমকে উঠলেও চুপ করে কঠিন হয়ে তাকিয়ে রইল সুব্রত। তারপরে বলল, জানি না।

—আপনি জানেন না হতেই পারে না। নাকের ডগাটা একটু যেন ফুলে উঠল।

রুচির হাতে একজোড়া লাল প্লাষ্টিকের চুড়ি। চায়ের কাপটা যখন সে নামিয়ে রাখল তখন তার হাতটা কাঁপছিল। বহুভাষিণী মেয়েটা, সুব্রতর মনে হলো, হঠাৎ যেন ভেতর থেকে বাধা পেয়ে চুপ করে যাচ্ছে। অথচ এই মৌনকে সে মেনে নিতেও পারছে না। প্রাণপণে নিজের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে সে নিজেকে সামলাতে চাইছে।

—রমেনের সঙ্গে তোমার কতদিনের আলাপ?

—বছর খানেকের। এখানে উনি বার তিনেক শেন্টার নিয়েছেন। রুচির শ্যামল রঙে একটু যেন রঙের ছোপ লাগল।—এবারে অনেকদিন খবর পাই নি। বলেছিলেন একবার নভেম্বর মাসে আসবেন। সুব্রতর ইচ্ছে করছিল রুচিকে বলে যায় সব। নিরর্থক প্রতীক্ষা, বন্ধ্যা প্রত্যাশার হাত থেকে মেয়েটা রেহাই পাক। কতদিন লাগিবে ভুলে যেতে? এই উদ্বেগঘন মুহূর্তটাকে বোমার মতো ফাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করল। রুচি সেই মুহূর্তে সচকিত হয়ে কী যেন শুনল।

তারপর ভেতরে গিয়েই, একটু বাদে ফিরে এল। তীব্র ভৎর্সনা ঘনিয়ে এল ওর গলায়—বলছিলেন না কেন? এই তো সবই জানলাম।

মৃদু গলায় জিজ্ঞাসা করল সুব্রত—তুমি শুনেছ সব?

—হ্যাঁ, মা কাঁদছিল। কাঁদতে কাঁদতে আমার অদৃষ্টকে গালাগাল দিতে দিতে সব বলল। সুব্রত আর রুচি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। হয়তো অনেক কথাই বলা যেত। রুচিকে সান্ত্বনা দেওয়া যেত। কিন্তু কেউ কোনো কথা বলল না। এই নৈঃশব্দ্যটা যেন একটা ভারী পাথরের দরজা। এটা খুলতে পারলে হয়তো সত্যের কাছাকাছি যাওয়া যায়। কিন্তু খোলার কথাটা কারো মনে এল না। একটা মানুষের কাছ থেকে প্রতীক্ষা কেড়ে নিলে তাকে কেমন দেখায় সেটা সুব্রত কখনো দেখে নি। রুচিকে দেখে সেটা জানল। সুব্রত বাড়ি থেকে বেরোবার জন্য প্রস্তুত হলো। রুচি ভেতরে চলে গিয়েছিল। সুব্রত বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে আবার ফিরে এল—দাঁড়ান। ফোলা ফোলা চোখদুটো সুব্রতর ওপর মেলে ধরে সে বলল—রমেনদার জন্যে এই পুলোভারটা বুনেছিলাম। শীত আসছে। ও বলেছিল তাড়াতাড়ি করতে। শীত তো আসছেই। আপনারও তো গরম কিছু নেই। এটা নিয়ে যান।

দু-ফোঁটা গরম চোখের জল পুলোভারটার ওপর পড়েছিল। হাত দিয়ে সযত্নে সেটাকে মুছে ফেলে সুব্রত ওটা কাগজে মুড়ে নিল। তারপর একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল—যাই।

ক্যালেণ্ডারটার দিকে অকারণে একবার তাকালো সুব্রত। নভেম্বর মাস। উনিশ শো উনপঞ্চাশ সাল যাই যাই করছে। ঘর বাঁধবে বলে কারা বাঁশ কাটছে কোথায়। বাঁশ কাটার আওয়াজ সুব্রতকে বরাবরই বিমর্ষ করে তোলে। পথে নেমে সুব্রত বুঝতে পারল শীত আসছে। রোদ মিষ্টি।

নিবাত নিষ্কম্প শেষ কার্তিকের মন্থর সকালবেলা। দুপাশে ধান জমি। পরিণত শস্যরাশি সম্ভাবনায় আনত। মাঝে মাঝে নিথর গাছপালা। ঝোপের বুকে বুকে টুনটুনি অথবা অন্য কোনো ছোট্ট পাখির ঝাঁক। আকাশ নিঃসীম নীল। চকচকে নারকোল গাছের পাতার ঝালরে শ্রান্ত চিল ডানা মুড়ে বসছে। একটু-একটু পাকা রং ধরেছে মাঠে—কালো কালো মানুষগুলোকে সেই পটভূমিতে সুন্দর মানিয়েছে। চলতে চলতে সুব্রত একটা সুপুরীগাছে ঘেরা দীঘির ধারে এসে পড়ল। দীঘির জলে সামান্য ঢেউ। সুপুরি গাছের ছায়া সেই জলের গভীরে সাপের মতো কাঁপছে। মাথার ওপর দিয়ে একঝাঁক

পাখি ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। যেমন শত শত বছর ধরে গেছে, শত শত বছর ধরে যাবে। দীঘিতে স্নান করছে যে মেয়েটি সে সূর্যপ্রণাম করছে। তার সুঠাম অঞ্জলিতে বহু আকাংক্ষা। পথের ধুলোয় কতকগুলি চড়ুই কেন কে জানে ধুলো মাখছে গায়ে। নিমের বিবর্ণ পাতা ঝরে পড়ছে পরম প্রশান্তিতে। অর্ধপক্ক ফলের মতো রমণীয় সেই মেয়েটির মুখ, স্তোকনম্র দুটি বুক, দৃঢ় উরু-ভঙ্গিমা। বিশাল জ্র দুটি যেন ডানা মেলে দেওয়া পাখি।

আমার কোনো অধিকার নেই—সুব্রতর সমস্ত অন্তর দীর্ণ করে শুধু এই স্বগতোক্তিটাই যেন বেরিয়ে আসতে চাইল। এ সবের দিকে তাকানোর আমার কোনো অধিকার নেই। শুধু আমার কেন—এই যুগের, এ পৃথিবীরই বোধহয় নেই। জীবন যদি ভাঙাচোরা, যদি খণ্ডিত এবং বিধ্বস্ত—তাহলে প্রকৃতির এই অবারিত প্রসাদও গ্রহণ করা যায় না। সেই প্রসন্ন প্রকৃতির বুক থেকে নিঃশ্বাস নিতে নিতে সুব্রত রমেনের কথা ভাবল। হাসপাতালে রমেন বস্তুত কাকে আশা করেছিল? নিশ্চয় রুচিকে। শেষ অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগেও সে হয়তো সেই আশাই করেছে। এ কথা ভাবতেই সে ক্রুদ্ধ হল নিজের ওপর। রমেনের শবভস্ম এখনো মাটির সঙ্গে মিশে যায় নি, অথচ সে এখনি আকাশকে স্নিগ্ধ বলে ভাবতে পারছে। কিন্তু ক্রুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বিস্ময়-সঞ্চারী সেই শিশির-ছিটোনো হেমন্তের সকাল স্পর্শ করতে লাগল সুব্রতকে। নিমের বিবর্ণ পাতা আলগোছে তাকে ছুঁয়ে ফেলল। শেষ পর্যন্ত, অধিকার নেই একথাটা ফণা ধরতে পারল না। ফণা নামাতেও পারল না।

চলতে চলতে একটা খালের ওপরে সাঁকোর মাথায় দাঁড়িয়ে সে নৈহাটির চটকলের বাঁশী শুনতে পেল। ঠিক করল নৈহাটি ষ্টেশনে পৌছে, হয় বাস নয় ট্রেন ধরে যেখানে যাবার সেখানে পৌছবে। পশ্চিমমুখো কাঁচা রাস্তা। নৈহাটির দিকে চলে গেছে। হাটে যাচ্ছিল একটা শাকওয়ালী বুড়ি। কাঁকালে শাকের ঝুড়ি। হাতে লাঠি। শনহুড়ি চুল। আপন মনে বক্ বক্ করতে করতে বুড়ি পথ হাঁটছিল। দুপায়ে শুকনো কাদায় সাদা রঙ ধরেছে। কাপড়ের গিঁটগুলোয় কাদা শুকিয়ে জমে গেছে। ঘোলাটে চোখে পিচুটি। সুব্রত ভাবল তার যদি শৈশব থাকত তাহলে সহজে বুড়িকে বলতে পারত —দাও বুড়ি, তোমাঁর ঝুড়িটা আমি বয়ে দিচ্ছি। ছোটবেলায় ওদের বাড়ির সামনে একটা মুচি বসত। তার খৈনি কিনে এনে দিত সে বাজার থেকে।

পিঙ্কিন্স বলত সেই মুচিটা পেরেক তোলার যন্ত্রটাকে, হাম্বর বলত হাতুড়িটাকে। পিঙ্কিন্স বললেই কেমন খৈনি খেয়ে পিচ করে থুতু ফেলার কথা মনে পড়ে যায়—মুচিটা এদিক ওদিক থুতু ছিটোতো। বুড়িটার ঘোলাটে চোখ সুব্রতর চেনা চেনা লাগল। এখনি যেন সেটা সে দেখে এসেছে রুচির চোখেই।

—কোথায় যাচ্ছ, বুড়ি মা ?

—কোথায় আর যাব বাবা, হাটে। তা যাতি পাল্লি তো যাবো, কাঁকালের বাতে পেড়ে ফেলেছে, আর যাওয়া! এক্কেবারে মুক্তোপুরের ঘাটে গেলি বাঁচতাম, তা পোড়া যমের কী আর নজর আছে বাবা, আমাকে চোখে দেখেই না।

—তা তুমি আর এই বয়সে হাটে যাও কেন, তোমার ছেলে মেয়ে নেই।

—আ কপাল, তা থাকলে আজ আমার এ দশা। এক এক করে সব তো খেলাম গো। পেরথম সোয়ামি। একটু আধটু সোয়ামি নয় বাবা, এই দশাসই এত্তোখানি মদ্দটা। তারপরে ছেলে, ছেলের ঘর ভর্তি এণ্ডিগেণ্ডি ছিল। বৌটার তখনো গরম বয়স, বলল, বুড়িকে নিয়ে ঘর করতে পারবোনি। দিলে আমাকে খেদিয়ে।

—তা তুমি বললে না যে আমার সোয়ামি-পুতের ভাত থেকে আমাকে কেউ ঠেলতে পারবে না ?

—ওমা বলতে যেন কিছু বাদ রাখলাম। শুনলে তবে তো। বৌটার ভাই এল, ভাইয়ে পিছু পিছু ভাজ, ভাজের মা এল, দেখতে দেখতে বাবা, বাবা এসে জমল, ভাজের ভাইরাও বলল তবে আমরাই বা বাদ থাকি কেন? দেশে আকাল নাগল যখন, ত্যাখন সব এক এক করে ভাগল। জমিটুকু সতীশ বাগের কাছে আটকা পড়ল।

—তোমার বউ গেল কোথায় ?

—নৈহাটিতে একটা ধানকলে কাজে নেগেছে। সে দপদপানি আর নেই। ব্যামোয় ধরেছে, মেয়েমানুষের রোগ। তার ওপর পা ফোলে, পেটে বোধ হয় জল। ছেলেগুলো কোনোটা আছে, কোনোটা মরেছে। একটা টেরেনে ভিক্ষে করে।

—এখন তুমি ঝাড়া-হাতপা একেবারে।

—না বাবা, তাই বা কোথায় বলো। মেয়ের পেটের একটা নাতি আছে। মেয়েটা ঐ ছেলেটাকে রেখে অনেক দিন হল মরে বেঁচেছে। বাপ

আবার বিয়ে করে পরিবার ঘরে আনল, সে মাগী এসেই ছোঁড়াটাকে ত্যাড়াল। ছোঁড়াটা এসে জুটেছে আমার কাছে। এল যখন তখন চিনতেও পারি না, সারা শরীরটায় হলুদ গুলে দিয়েছে যেন। চোখ দুটো যেন কন্টিকারির ফুল! মুখ ফুলে ঢোল। আমার কাছেই আছে। কুতুবপুরের তাগা পরিয়েছি। শাওন-কালীর মালা দিয়েছি মাথায়। তা কই, আরামের তো কোনো কিনারা দেখছি না।

—ওষুধ খাওয়াও, ওষুধ না খাওয়ালে সারবে কী করে ?

—কোথায় ওষুধ পাব বাবা, কুতুবপুরের মাগনার ডাক্তার আছে। সরকার থেকে দিয়েছে। তাদের কাছে নিয়ে গেছলাম ছোঁড়াটাকে। তা দেখলে যত্ন করে, মিথ্যে বলব না। দেখলে, ওষুধ লিখে দিলে। কমপাণ্ডার বলে কী যদি একটা আধুলি দাও তো ওষুধে কাজ হবে, নয়তো ওষুধ ঢোঁড়া করে দেবে। কোথায় আধুলি! তাও কষ্টে ছিষ্টে একদিন যোগাড় করলাম। কোমরের বাতে নিজে নড়তে পারি না, ছোঁড়াকে বললাম যা ওষুধ নিয়ে আয়। দুপপুর বেলা ছোঁড়া ঘরে ফিরে এল, বলল পয়সা হারিয়ে গেছে। তারপর এই নামুনি, এই নামুনি। পরে শুনি কী যে সে আবালসিদ্ধির হাটে গুপির দোকানে তেলে ভাজা খেয়েছে বসে বসে। কপালের কথা আর কী বলব বলোদিনি। একটু গোলা দুধ দেয় বাবুদের সদর থেকে, সে দুধটুকুনি গয়লাদের কাছে বেচে বেচে আধুলিটা করনু, এই আকালে সেটাও মাটি।

—তা বলে ফেলে রেখে দেবে অমনি।

—তাই কি পারি বাছা, আমার পেটের মেয়ের পো, কথায় বলে আসলের সুদ, ফেলতে কি পারি! দেখি সামনের শীতে মুচকুন্দপুরে বাবার থানে হত্যে দেবো না হয়। বাবার দয়া হলে বাবা ওষুধ বলে দেন, বিশ্বেস নিয়ে খেলে আর কথা নেই। কলিমুল্লার বড় মেয়ের পাথুরি হয়েলো। মোছনমান —তাও বাবার দয়া হয়েলো। বললো থানের পেছনে বুনো ওল আছে উপড়ে খা গা যা। বললে পেত্যয় যাবা না—পাথুরি কোথায় কমনে মিলিয়ে গেল, হপ্তা পোয়ালো না অবধি। সুব্রত চুপ করে শুনতে শুনতে পথ হাঁটছিল। বুড়ির পায়ের কাদার চাপড়া শুকিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে পথের ধুলোয় মিশে যাচ্ছে। লাঠি ধরে ধরে বুড়ি এগিয়ে চলেছে। পায়ের গিঁটের কাছে কালো কালো কারের সঙ্গে একটা কড়ি বাঁধা। পা ফুলছে বুড়ির।

—দোব তো হত্যে বলছি, যা বাতের দশায় ভুগছি, কোমরই সোজা

করতে পারি না। চোখের নজর কমে গেছে। সেই ভোর রাতে উঠি। পোয়াতে তারা তখন ঐখেনে দপদপ করে। এ-পুকুরে ও-পুকুরে শাকঘাস ছুটো ছিঁড়ে শহরে যাওয়া—একটু জিরেন তো পাইনা, কোমরের আর দোষ কি দোব বলো। তোমার ঘর কোথায়, বাবা ?

—এখানে নয়।

—ঘরে কে আছে তোমার ?

—মা আছে। তোমার মতো বুড়ি।

—আর ?

—ভাই আছে, আর কেউ নেই।

—আ কপাল। বুড়ি মাতারে যত্ন করে কেডা, পরিবার নেই তোমার ?

—না। ইচ্ছে করেই বলল না সুব্রত যে ভাইয়ের বিয়ে হয়েছে।

—হেই মা। তা বৌ এনে দাও মাকে। কী ছেলে মা! কোজ্জাবো। বিয়ে করো। বৌ আনো। ঘর ভত্তি সোমসার হোক। খোকা, খুকি, ঘর বাড়বে, মানুষ বাড়বে, খাবার লোক বাড়বে, তবে তো। হ্যাঁ বাবা···বুড়ি বকতে বকতেই চলল, কল্‌মল্ করবে খোকা খুকি, তবে তো ঘর—সুব্রতর ভাল লাগল খুব। রুচির দেওয়া পুলোভারে আর বুড়ির দেওয়া পরামর্শে হয়তো কোনো মিলই নেই। কিন্তু বুড়ির কথাগুলো শুনতে শুনতেই ও আনমনে পুলোভারটা চেপে ধরল। ভাবল আর একবার রুচির কথা। যে মেয়েটা ভয়ানক বক বক করত বলে সে বিরক্ত হত।

দিনের বেলায় নৈহাটী স্টেশনের চেহারা অনেকদিন দেখে নি সুব্রত।

নতুন নতুন উদ্বাস্তুর দল দিনের পর দিন এদিকে চলে আসছে। রাণাঘাট আর নৈহাটী স্টেশনের ওপর উদ্বাস্তুদের ভীড়ের চাপ পড়েছে সবচেয়ে বেশি। সরকারি ক্যাম্পগুলো সম্বন্ধে নানা গুজব। পুনর্বসতির ব্যাপারে অবিশ্বাস! একজায়গা থেকে উৎখাত হবার ফলে মানসিক ভারসাম্যের বিচ্যুতি মানুষগুলোকে উদভ্রান্ত করে তুলেছে। পাকিস্তান থেকে আসা প্রতি ট্রেন থেকেই শত শত সংসার নামছে। তার অন্তত আদ্ধেক বেশ কিছুদিনের মতো ঠেকে থাকছে প্লাটফর্মে, স্টেশনের গাড়িবারান্দায়। বেলা নটা। সুব্রত স্টেশনের ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে একটা চায়ের দোকানের বেঞ্চির ওপর বসল। ভাঙা তোরঙ্গ, ঝুড়ি আর পুঁটলি দিয়ে সীমানা তৈরি করে সংসার পেতেছে এক একটা গেরস্থগুলি। এরি মধ্যে

উনুন, বিছানা, রোগীর যন্ত্রণা। বাসি ভাত খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে পোটাপরা হাড়বেরকরা বাচ্ছা ছেলে। মাই খাওয়াতে খাওয়াতে প্রৌঢ়া মা কোলের ছেলেকে পিটছে। আট দশ বছরের একটা ছেলে একটা মোটা পুলিশ কনস্টেবলের ঘাড়ে মালিশ করছে। এদিকে একটা হাত আয়নায় গোঁফের পাকা চুল তুলছে একটি পুরুষ মানুষ। মাদুরে শুয়ে শুয়ে—পরম নির্ভাবনায়। জলে কাদায় প্যাচ প্যাচ করছে গোটা তল্লাট। এখানে ওখানে ছোট ছেলেরও মূত। ঝগড়া, সীমানা নিয়ে, কলের জল নিয়ে। চেঁচামেচিতে, ইঞ্জিনের স্টীম ছাড়ার শব্দে, যাত্রীদের চিৎকারে শব্দের নরক। এঁটোয় আবর্জনায় বমিতে পায়খানায় গন্ধের নরক। এর মধ্যেই একটা কমবয়সী মেয়ের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে একটা রূপোর পানের ডিবেওয়ালা বাবু। আর এই সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে সুব্রতর নজরে পড়ল একটি মেয়েকে। মাথার ঘোমটা খসে গেছে তার। স্ফীতোদর। ক্লান্ত মুখ। বসা চোখ। এই সমস্ত গোলমাল হৈ-চৈয়ের মধ্যে সে যেন একান্ত একলা। বড়ো বড়ো চোখ দুটোয় আতঙ্ক মাখানো। রুক্ষ সিঁথিতে প্রায়-বিবর্ণ সিঁদুর। ভরা পোয়াতি মেয়েটা। স্থির চোখে এই জটিল জনারণ্যের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে বোধ হয় চরম মুহূর্তের প্রতীক্ষা করছে। উদ্বেগে যেন বোবা হয়ে গেছে সে। তার পাশে বসে যে দলটি তাস খেলছিল তারা হয়তো বৌটারই কেউ হবে। আবার নাও হতে পারে। দোকানীর কাছে সুব্রত চায়ের দাম জানতে চাইল। আর সে বৌটির দিকে ফিরে তাকালো না। চা খেতে লাগল; যারা তাস খেলছিল তাদের ডাক শুনতে লাগল। আছি—আছি—

নাকে রুমাল চেপে ভিড় ঠেলতে ঠেলতে একজন পুলিশ-কর্মচারি, মনে হল উঁচু পদের, এদিকে এগিয়ে আসছেন। সুব্রত তাড়াতাড়ি চায়ের ভাঁড়ে মুখ ডোবালো। অফিসার ভদ্রলোকটি চায়ের দোকানের সামনে এসেই দাঁড়ালেন। চলেই যাচ্ছিলেন, কী ভেবে আবার তাকালেন। তারপরে একেবারে সুব্রতর হাত চেপে ধরে বলে উঠলেন—সুব্রত না ?

—দেবু ? দুজনেই খানিকটা চুপ করে রইল। তারপর স্মিত মুখে দ্বিতীয় জনা শুরু করলেন—

—চিনতে পারলে তাহলে ?

—না চেনারই কথা। বদলেছ। ধড়া-চুড়োয় তো বটেই। আড়েও খানিকটা—

—অপরের জায়গা এনক্রোচ করছি, এঁ্যা? সম্মিলিত হাসি হল খানিকটা।

—আছ কোথায়?

—মিড্না পোহ্, সদর। তোমার খবর বলো।

—আছি। আটচল্লিশ—আছি, উনপঞ্চাশ, আছি।

—এসো, ওয়েটিং রুমে চলো, বসা যাক খানিকটা। অনেকদিন পর।

ফার্স্ট ক্লাশ ওয়েটিং রুমের চাবি থাকে এ, এস. এমের কাছে। তাকে ডাকিয়ে চাবি খুলিয়ে ভেতরে গিয়ে ওরা বসল। তারপর দু পেয়ালা চা আনালো ওরা। কালো পালিশ করা গোল টেবিলে বক-শাদা পিরিচ রাখল। সোনালি পাড়-আঁকা টি-পট থেকে পাতলা পেয়ালায় চা ঢালতে লাগল ওরা। তারপর কাঠ-বেতের সোফায় হেলান দিয়ে ওরা কথা বলতে লাগল।

—তোমাকে এ বেশে আশা করি নি দেবু।

—কেন? কী আশা করেছিলে?

—চাদর দোলানো অধ্যাপক? তুমি নিজেও বলতে তাই? বলতে না?

—বলতাম! কাকে কাকে বলতাম বলো তো?

—আমাকে বলতে, মঞ্জুশ্রীকে বলতে।

—মজাটা এইখানে তুমি মনে রেখেছ যে বলতাম, মঞ্জুশ্রীর মনেই নেই।

—লেকপোয়েটদের ওপরে থিসিস করবে বলেছিলে।

—এতদিন বাদে নামটা আবার শুনলাম, যেন স্ট্রেঞ্জ নেম্ মনে হচ্ছে।

—সিগারেট দাও একটা। টিনটা টেবিলে রাখল দেবু।

—আমার বিয়ের খবর পেয়েছিলে? তুমি যাও নি, রমেন গিয়েছিল। ভাল কথা ওর খবর কী?

—ঠিক জানি না। নিপুণ পুরনো ভঙ্গিতে দেশলাই কাঠিটা হাওয়া ছুলিয়ে নিভিয়ে ফেলল।

—মঞ্জুশ্রীকে তুমি জানতেই। সেমিনারে যখন প্রবন্ধ পড়তাম ও সামনে না থাকলে ভাল লাগত না। এ নিয়ে বন্ধুরা, তুমিও ঠাট্টা করতে। ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়েই আমরা রেজিষ্ট্রি করলাম। কণ্টাই কলেজে ইংরিজির

লেকচারারের পোস্ট খালি ছিল। এ্যাপ্লাই করলাম। ওরা টেলিগ্রাম করে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দিলে। মঞ্জুশ্রীকে নিয়েই কণ্টাই চলে গেলাম। এ পর্যন্ত সব ঠিক যেমন ঘটবার তেমন ঘটল। গোল করে ছুটো রিং করল দেবু। সুব্রত ছাইটা ঝেড়ে আড়চোখে দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিল। নটা-সতেরো।

—যেমন ঘটবার তেমন ঘটল মানে? সুব্রত জিজ্ঞাসা করল।

—মানে আমাদের বাড়িতে স্টিফ অপোজিশন প্রথমটা, মঞ্জুশ্রীরা আমাদের স্বজাতি নয়। এবং আভিজাত্যে আমরাই নাকি পাল্লাভারি।

—তাতো বটেই তোমরা হলে নসীরামপুরের মুস্তাফি—

—একজ্যাক্টলি। আর মঞ্জুশ্রীর বাবাও ব্যাক করলেন আমার দাদা মায়ের অমত আছে শুনে। সে গোলমালের দিনগুলো রিকালেক্ট করতেও ইচ্ছে করে না। মা শয্যা নিয়েছেন। ফাদার বিকেম সোলেন। দাদারা বিদ্রূপ করছেন। বৌদিরা মজা উপভোগ করছেন।

—মঞ্জুশ্রী?

—শুকনো মুখে কফিহাউসে একবার করে দেখা করে আর জানতে চায় আমি কী ভাবছি? কিন্তু ওই যা বললাম যেমন যেমন ঘটবার সবই ঘটল। আমি এসব সত্ত্বেও বিয়ে করলাম। অনুপম আর মীনাক্ষী উইট্নেস। সেভেনটিনথ মার্চ, নাইনটিন ফর্টি এইট। এবং মাস ছয়েক বাদে আবার সোনার সংসার ফিলিমের শেষ দৃশ্য। মা মঞ্জুকে আশীর্বাদ করলেন। বাবা সেরিমনিয়াল ফিস্ট দিলেন—তুমি যাও নি। রমেন, ফৈজু, কাকারিয়া সব গিয়েছিল। জমেছিল খুব। কাকারিয়া সেদিন ফুল ফর্মে ছিল। বলদেব-সিরিজের পাঁচটা চুটকি ছেড়েছিল, সিম্পলি সাইড স্প্লিটিং।

—চমৎকার উপসংহার। এর মধ্যে গোলমাল কোথায়?

—সেইটাই পয়েণ্ট। দেখতে গেলে কোনো গোলমাল নেই। গরমের ছুটিতে আমরা বাড়ি এসেছিলাম। ছুটি শেষ হতে কলকাতা থেকে আবার কণ্টাই ফিরে গেলাম। এ্যাণ্ড—এ্যাণ্ড কী বলো দিকি?

—কী?

—মঞ্জুশ্রী ইজ কমপ্লিটলি চেঞ্জড!

—চেঞ্জড মানে?

—তুমি যে মঞ্জুকে জানতে সে আকৃতিতে ছিল রোগা, ফিগারের

প্রশংসা সবাই করতো, স্বভাবে শান্ত, মিক, সোবার, ডোসাইল। মাইনাস চারের চশমা চোখে বই মুখে বসে থাকত। তুমাস সে আমাদের বাড়িতে কাটালো। আমার বৌদিদের কাছে, বোনেদের কাছে। বৌদিদের সঙ্গে ওঠা বসা, তুপুরে ঘুমুনো, সন্ধেয় সামাজিকতা সব সে সমান তালে চালিয়ে গেল। তুমাসে মঞ্জুশ্রী বলব কি স্থব্রত যাকে বলে মুটিয়ে গেল। আর কণ্টাইয়ে পৌছানোর তুদিনের মধ্যে সে আমাকে কমপিটিটিভ পরীক্ষায় বসবার জন্য তাগিদ দিতে শুরু করল। আমি বই কেতাব ঝেড়েঝুড়ে লেকপোয়েটদের ওপর লেখাটা দাঁড় করাবার জন্য তখন ব্যস্ত। মঞ্জুর বায়না শোনার মতন অবস্থা নেই। ঠিক এমনি সময়ে, বিদিশাকে মনে আছে? বিদিশার সঙ্গে মঞ্জুর দেখা।

—বিদিশা কোথা থেকে এল?

—বিদিশার বর তখনই কণ্টাইয়ের এস. ডি. ও হয়ে এল। ভগবানের দেওয়া রূপ প্লাস বাবার টাকা প্লাস এম. এ.-র রেজাণ্ট স্থতরাং আই. এ. এস জামাই পাকড়াতে স্থরেশ চৌধুরীর মোটেই বেগ পেতে হয় নি। বিদিশার সঙ্গে মঞ্জুর কিরকম মাথামাথি ছিল জানতে তুমি—

—দেখাটা হল কোথায়?

—কণ্টাইয়েরই একটা স্কুলে, প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশন সেরিমণিতে, এ্যাণ্ড মিসেস তলাপাত্র তার মানে বিদিশা গেভ্ অ্যাওয়ে দি প্রাইজেস। বোঝো অবস্থাটা। মঞ্জুশ্রী বাড়ি ফিরে আমাকে নোটিস দিল আমি পরীক্ষায় বসব কিনা তাকে জানিয়ে দেওয়া হোক। সিগারেটের টুকরোটা ছাইদানিতে টিপে দিতে দিতে দেবু গল্পের উপসংহারে পৌছল—তারপর ডবলিউ. বি. সি, এস—

—তারপর?

—এখন আমি ডেপুটি স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পোলিশ—মিডনাপুঃ। লেক-পোয়েট বাইশ হাত জলের তলায় চলে গেছে।

হাই তুলল স্থব্রত। দেবুর মেদস্নিগ্ধ চিবুকের ভাঁজে কোথাও অতৃপ্তি নেই। লেকপোয়েটদের জন্যে তার মনগড়া তুঃখটা মোটেই বিশ্বাস্য নয়। তবু তুঃখ করতে হলে যে এইরকম একটা ব্যাপার নিয়েই তুঃখ করতে হয় এ কাণ্ডজ্ঞানটুকু এখনো দেবুর আছে।

—অবশ্য বেশিদিন মিডনাপুরে থাকছি না। বিদিশার বাবাকে মঞ্জু ধরে রেখেছে। স্থরেশবাবুকে তুমি জানোই, হোম-মিনিস্টার তো বটেই,

ডাঃ রায়েরও ঘনিষ্ঠ বন্ধু উনি—ক্যালকাটায় নাহোক এদিকে আসতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। ওখানে বলবো কি তোমাকে ভাই এ্যাসোসিয়েশন নেই।

—তুমি কি আপাতত সেই তদ্বিরেই কলকাতায় এসেছ নাকি?

—আরে না না, তোমাকে তো আসলে খবরই বলা হয় নি। মঞ্জু তো কলকাতায়। নার্সিং হোমে রয়েছে। মিষ্টি করে একটু হাসল দেবু।—বড়দার তার পেয়ে কাল এসেছি। আমাদের একটা ছেলে হয়েছে স্থব্রত।

—কনগ্র্যাচুলেশন। দেবুর মুখ একটু চকচক করছে স্থব্রত দেখল।

—ন' পাউণ্ড ওজন হয়েছে ছেলেটার। মঞ্জুর অবস্থা কাহিল। অবশ্য নার্সিং হোমটা ভাল। দৈনিক তিপান্ন টাকা করে নেয় বটে এ্যারেঞ্জমেণ্টস খুব চমৎকার।

—তা এদিকে কোথায় চলেছ?

—মঞ্জুর বাবাকে নিয়ে আসতে যাচ্ছি। উনি তো সেই চোখের অপারেশনের পর ভাল দেখতে পান না। সংবাদটা দেওয়া হবে, আর যদি আসতে চান তো নিয়ে আসবো।

দশটা বাজে-বাজে। এবার উঠতে হবে, স্থব্রত ভাবল।—কলকাতার দিকে চলে এসো, একদিন যাওয়া যাবে তোমাদের ওখানে।

—খুব খুশি হবে মঞ্জুশ্রী। নিশ্চয় যাবে। আন্তরিক স্বরেই বলল দেবু। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একটা হৈ-চৈ শোনা গেল। ট্রেন এল। দেবু উঠল। এই গাড়িতেই ও যাবে। স্থব্রতর হাতের ওপর হাত রেখে একটু ঘনিষ্ঠ হল দেবু। তারপরে, আচ্ছা, বলে দরজার দিকে এগুলো। স্থব্রতও ওখান থেকে বেরিয়ে একনম্বর প্লাটফর্মের গেট পেরিয়ে স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়াল। কফিহাউসের দিনগুলোর জন্য আর স্থব্রত কোনো কষ্ট হয় না। দেবুরও হয় না। কিন্তু দেবুর কষ্ট না হওয়াটা যেমন, তার না হওয়াটা ঠিক তেমন নয়। দেবুকে দেখে আর সমর্থন বা অসমর্থনের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু স্থব্রতর ব্যাপারে, তার নিজেরই কাছে, ঠিক বেঠিকের প্রশ্ন আছে। এ কথাটা স্থব্রতর বড় বেশি বেশি মনে হল যে স্থব্রত ব্যানার্জি হয় ভুল করছে, নয় ঠিক করছে। কিন্তু এই ভুল আর ঠিক-এর ধাক্কা খেতে খেতে সে চলেছে যে এটাই তার কাছে বড় বলে মনে হল। বার্নস-এর কবিতা অনুবাদ করতে করতে অথবা লেকপোয়েটদের ওপর থিসিস বানাতে বানাতে কিসের টানে, কিসের ধাক্কায় দেবু এখানে এসেছে

তা দেবুও জানে না। একদিন কফিহাউসের সবুজ দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেবু বলত কোয়েস্ট, কোয়েস্টই হল আসল। এ কথাটা সে উচ্চারণ করত যেন দৈবী প্রত্যয় পেয়েছে। আজকেও দেবু কিন্তু খুঁজছেই। ছোট ছোট অহঙ্কারগুলোকে খুঁজছে। ন-পাউণ্ডের নবজাতক, তিপ্পান্ন টাকা দৈনিকের নার্সিং হোম, বিদিশার কলাকৌশল, মিঃ চৌধুরীর ডাঃ রায়ের সঙ্গে দহরম মহরম—এ সমস্তই সেই ছোট ছোট অহঙ্কারের শিলাফলক। মির্জাপুর আর হ্যারিসন রোডের ক্রসিং-এর কাছে একটা বাড়িতে কারা কোকিল পুষেছিল। দুপুর রোদে ইউনিভার্সিটি থেকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল দেবু। ট্রাম বাস অটোমোবিলের ট্র্যাফিক কলরোলের মাঝখানে কোকিল ডাকলে কেমন শোনায় জানতে গিয়েছিল ওরা।

আরো একটা দিনের কথা মনে পড়ল সুব্রতর। বিরাট একটা মিছিলের যাত্রী ছিল ওরা। দীর্ঘ পথ ঘুরে ঘুরে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে মিছিল জড়ো হয়েছিল। দুটি পোস্টগ্রাজুয়েট ছাত্রীর হাতে একটি ফেস্টুন ছিল। শাদা কাপড়ের ওপর লাল হরফে লেখা ছিল—ফর এ হ্যাপি ইউথ ইন এ ফ্রি ইণ্ডিয়া। দেবু সেই ফেস্টুনটার দিকে তাকিয়ে সুব্রতকে বলেছিল—সুব্রত ফেস্টুনের লেখাটা পড়লে কেমন মনটা বিষণ্ণ হয়ে যায়। সুব্রত ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। দেবু বলেছিল—ফ্রি হয়তো একদিন হবে ইণ্ডিয়া কিন্তু হ্যাপি ইউথের দেখা পেতে আমাদের জীবন কেটে যাবে। দেবু আর এ দুঃখটাও করে না নিশ্চয়। দেবু একবারও কি দাঁড়াল এই ভিড়ের মাঝখানে! নৈহাটী স্টেশনের সামনে কলকাতাগামী বড়ো রাস্তায় দাঁড়িয়ে সুব্রত আর একবার এই রাস্তাটাকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করল। ঠিক এই রকম ইচ্ছেই তার করেছে অনেকবার অতীতে। রাস্তাটা সেই রকমই আছে। স্টেশনের উত্তরে রাস্তার ওপাশে নৈহাটী সিনেমার দেওয়ালে কোনো এক চিত্রতারকার বিশাল মুখ তুলি দিয়ে আঁকছে একটা লোক। বাসস্ট্যাণ্ডে হৈ-চৈ। সাইকেল রিকসাদের সমবেত ভেঁপু আর মোড়ের পুলিশের অশ্লীল মুখখিস্তি, ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানদের কোচবক্সে বসে ঢুলুনি—রাস্তাটা সেই একই রকম আছে। বিধুর হোটেলের দোতালা থেকে উৎকলী পাচক ঝিকে ডাকছে। খাবারের দোকানের ছোকরা চাকর চাদরবোঝাই শ্যামাপোকা রাস্তায় ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছে। বাসন্তী কেবিনে কাউণ্টারে বসে আছে মাধবদা। এখানেই শেখরের আসবার কথা।

এই সেই রাস্তা। উনিশশো ছেচল্লিশ সালের ফেব্রুয়ারির এক দ্বিপ্রহরে একে দেখেছিল সুব্রত। দিনটা ছিল রসিদ আলি-দিবস। জগদ্দল আতপুর কাঁকিনাড়ার মিলগুলোয় হরতাল হয়ে গেল দেখতে দেখতে। হাজিনগর পর্যন্ত চটকলবাজার হঠাৎ যেন বুনো ঘোড়ার মতো কেশর ফুলিয়ে অবাধ্য হয়ে উঠেছিল। ক্ষ্যাপা শ্রাবণে যেমন এক একদিন নানাদিক থেকে দলবেঁধে মেঘেরা এসে জোটে, নৈহাটীর এই স্টেশন রোডের তেমাথায় তেমনি সেদিন নানাদিক থেকে মানুষের মিছিল এসে জুটেছিল। হাতে মোটা মোটা বাঁশের লাঠি। ফেব্রুয়ারির উত্তপ্ত রোদে গনগনে মুখের মেলা। মানুষ আর মানুষ। জয় হিন্দ শব্দ দুটো কখনো মনে হয়েছিল মেঘের ডাক, কখনো মনে হয়েছিল সমুদ্রের ঢেউ। হাজার হাজার গলায় মিলিত উচ্চারণ স্টেশন বিল্ডিঙের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলেছিল। স্টেশন পাহারা দিচ্ছিল একঝাঁক গোরাসৈন্য। সকালবেলাতেই মিলিটারি ডাকা হয়েছিল। স্পষ্ট মনে আছে সুব্রতর দাউ দাউ করে জ্বলছিল মোকামা এক্সপ্রেস। ব্যাণ্ডেলে জনতা পথরোধ করায় ঘুরপথে নৈহাটী দিয়ে যেতে চেয়েছিল গাড়িটা। সকালবেলাতেই তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। বিশাল ধোঁয়ার কুণ্ডলীর নিচে আগুন জ্বলছিল দুপুর বিকেল সন্ধে। গুলি চলেছিল বিকেলবেলা। আর গুলি চলার পর কী আশ্চর্য থমথমে হয়ে গিয়েছিল চারিদিক। তিনজনের লাস পড়েছিল এই তেমাথার ওপরে অনেক রাত অবধি। অনেক রাত অবধি আকাশটা লালচে ছিল জ্বলে যাওয়া মোকামা এক্সপ্রেসের আগুনে। মড়া তিনটের মধ্যে একটা ছিল রিকসাওয়ালা সুখলাল। দরাজ ছাতি চিতিয়ে টান করে সে যখন সাইকেলরিকসা প্যাডল করত মনে হত ঘোড়সওয়ার। সুখলালের মা স্টেশনবারান্দায় বসে বসে একা একা কেঁদেছিল পরের দিন বেলা নটা পর্যন্ত, সুব্রতরা শহিদমিছিলের যোগাড় করে মালা নিয়ে না আসা পর্যন্ত। মালা দেখে সে ভড়কে গিয়ে চুপ করে গিয়েছিল। ফর এ হ্যাপি ইউথ ইন এ ফ্রি ইণ্ডিয়া—সুখলালের লাস দেখে সুব্রত ভেবেছিল।

(ক্রমশঃ)

কোনো জন্মের রূপকথা

দিলীপ চট্টোপাধ্যায়

অনেক দূর থেকেও, টিলার মাথায় অবস্থিত বলেই মন্দিরের প্রায়োজ্জ্বল চূড়া দেখা গেল। কোনো দূরগামী গোয়ালিনীর মতো, হঠাৎ গতি স্থির করে একপলকে সূর্যাস্ত দেখে নেওয়ার ঢঙে ফেরান মুখ, সেই কারণেই মাথার কলসির গা ঘুরে রক্তস্রোত হু হু করে ছুটে গেল আকাশে। মন্দিরের চূড়ার দিকে চোখ রেখে দল প্রধান জিজ্ঞাসা করল—পথে বিপদ আর ভয় আছে হে।"

বাকী তিনজন, কোনো কথা না বলে, দল প্রধানের মুখের দিকে চেয়েছিল। আরো কিছুক্ষণ পরে আবার কেমন অদ্ভুত অবিশ্বাস্য ভঙ্গিতে বলে উঠল—"তোমাদের সাহস আছে তো ?"

উচ্চারণ কালে শব্দগুলির স্বরভঙ্গতা দু পাহাড়ের মধ্যবর্তী প্রতিধ্বনিময় অন্ধকারের ন্যায় মোচড় খেয়ে মিশে গেল গলার মধ্যে।

দ্বিতীয় জন স্পষ্টতই দুবার দুদিকে ঘাড় হেলাল। তৃতীয় জন কেবল উন্মাদের মতই চিৎকার করে হেঁকে উঠল—নিশ্চয়।

তাদের সম্মুখে কূলহীন মজা-নদীর বালি, শ্মশান, অপরিচিত আত্মমগ্ন স্তব্ধ শূন্যতা, ভাঙা দেউল, জীর্ণ প্রাচীর ছিঁড়ে 'সর্পাকৃতির শিশুচারা' একাকী ম্রিয়মান ক্ষিতিঅপতেজমরুৎব্যোম, আর হাহাকার, নির্বাপিত প্রায় হাহাকার কূল ঘিরে।

মন্দির আর মজানদীর মাঝখানে দূর বিস্তারী বহু পথের ব্যবধান, ধুলা আর বেলাশেষের ম্লান আলোয় লাল পাহাড়ের সারি, নুয়ে পড়া বৃক্ষগুলি এতদূর থেকেও বিচ্ছিন্ন করা যায়, যেন প্রশাখায় প্রবাহিত কলকাকলী এখানেও কেঁপে যায়। মন্দির চূড়ায় অপেক্ষারত উৎকণ্ঠা তাদের মুখোমুখি ভাসছিল।

নদীপথ ধরে নেমে যাবার আগে তারা চারজন সহসা যেন শেষবারের মতো পিছনে ফিরে দেখল শ্মশান। শ্মশানের বিদীর্ণ প্রাচীরের পার ধরে গ্রাম্য রাখালিয়া পথ গোখুরের আভাসে অস্থির। গৃহবধূর দল সন্ধ্যার তুলসী

মঞ্চের দিকে চলে যাচ্ছিল দল বেঁধে, জল উপচে কাঁখালের বেশবাসে অনুপম ময়াল লাবণ্য। গরবিনীর ভারী পিঠ জুড়ে কালো চুলে ফুলছাপা মমতায় গৃহস্থ গোয়ালের গন্ধ। কোলে ভরা কলসি, অলঙ্কার শব্দ করছিল। কারুর আড়চোখ চাউনিতে বুকটাল খাওয়া বিস্ময়ের ঘোর, লজ্জা, ভাদরের ভরা ভারি দিকহীন বান, আকাশ ডুবে যায় তার স্রোত কলরোলে—"এ্যাই সেজোনি তোর কোলে আবার নতুন আসছে শোনলাম।"

সেজবউ ঘাড় আনত, কেমন অপটু আদুরে গা টানা গতি, উত্তরে ঘাড় তুলে ভরা মুখে চকিতে খামোখা হাসল বেশ বোঝা গেল। সে হাসির অন্ত নেই, গা গতর ছাপিয়ে ঢলে পড়েছিল শ্মশান নদীময় মাঠ ঘাট একাকার করে নিয়ে। অন্য একজন বয়স্ক অধিকারী অভিজ্ঞ মুখ টান করে কলকল করে উঠল—"দেখিস বাবা, সোহাগথাকী জামাই শালা আমাদেরকেও না ভোলে। তইলে…"

তাদেরই গা ঘেষে যখন হাঁটছিল তারা ভাঙাচোরা চিত্রময় অতীতের ছবি কেঁপে উঠছিল চোখের উপর। আবছায়া জ্যোৎস্নাময় স্মৃতি সেই নির্বাসিতদের বুক কাঁপাচ্ছিল বারবার: গোয়ালের গরুর অবিরাম হা-ম্বা ডাকে পথভোলা বাছুর তালকাটা চারপায়ে ঘরের উষ্ণতায় ডুবে গেল। আকাশের মতো দু পাশের ঘাড় কাত করা চালে মেঘ আর বুনো পাখি, বকের পাখনায় ভাসমান আশ্বিন কার্ত্তিকের রোদ টান টান নরম বেলা। শালুক বিলে চাপা আলোর গন্ধে পোক ওঠা গোড়ের মৌতাত। দিনগুলো রাতগুলো যেন আঁচলে জড়ান কড়ি খেলে খেলেই সময় পার করে। …শঙ্খধ্বনিতে স্বামীরা গৃহমুখী, তেলের আলোয় বউ-এর ফর্সা মাজা মুখ যেন প্রতিমার মতো ডেকে নেয় তাদের। পথ ঘাটজুড়ে নামা অন্ধকারে কোনো রূপকথার ব্যস্ততা: দাওয়ায় লণ্ঠনের অপ্রাকৃতিক পরিসর মেপে সরে দাঁড়ান অন্ধকার মেটে দেওয়ালের ছায়ায় শিশু কণ্ঠে "তাপ্পর" মৃদু নিঃশ্বাসের শব্দ; বৃদ্ধার দু চোখে অহঙ্কার চক চক করে জ্বলে, কুলবধূ অলঙ্কার বাজিয়ে উঠোন পার হয়, পায়ে আলতা, গায়ে ময়ূরকণ্ঠী শাড়ীর বাহার কেটে পড়ে।

সামনের দুস্তর পথভেদ জুড়ে অতঃপর শুরু হলো গ্রামগল্পের চির তরুণ পাঠ। প্রেম আর প্রয়োজনের কাহিনীতে গড়েওঠা সান্ধ্যক্ষণ। চন্দ্র কোলাহলের যত রাত প্রস্তুত হয় একে একে। দিগন্তের কাঁচা মাঠ পার হয়ে সূর্যাস্ত। সমুদ্যত উজ্জ্বল শস্যরাশির মাঝ বরাবর অনন্ত মেঠোপথ জুড়ে

রাখাল বাঁশরীর শুদ্ধ রাগে আকুল হয়ে যায় সারা গ্রাম, শস্য ক্ষেত্র, ফসলের গায়ে হেলে পড়া লাল বাতাস। এই পথ ধরে গোধূলি নিয়ত পরিবর্তন নিয়ে আসে, সেইখানেই গৃহস্থের গল্পরাশি। আঁচলের জলে সিক্ত পথ বেয়ে কোনো গ্রাম্যবালক হারান রূপকথার খোঁজে নদী শ্মশান জনপথ ভুলে এক অপূর্ব রূপকথার আলোয় চোখ মেলে ধরে।

এমন সময় আচমকা দলপ্রধানই বলে উঠল—আজকে আর সামনে যাওয়া ঠিক হবে না, আমরা অইখানের শ্মশান মন্দিরে আশ্রয় নেব।

বাদবাকী তিনজনও বেশ ক্লান্ত, কেমন অলস ঘুম ঘুম ভাবে দু চোখের পাতা ভারি হয়ে উঠেছিল, সেই কথায় সায় দিয়ে ঘাড় নাড়ল। আর না সামনে এগিয়ে ডানদিকের অপেক্ষাকৃত সরু পথ ধরে পোড়া মন্দিরের চত্বরে এসে দাঁড়াল। ফাটা শ্যাওলা ঢাকা কাল হুমড়ি খেয়ে পড়া চার দেওয়ালের গায়ে মারাত্মক নীল জ্যোৎস্না হেলেছিল, গায়ে ছোটবড় শিশু চারার জট বাঁধা ছায়ায় বাঁকা চিড়ের ফাঁক দিয়ে এলোমেলো বাতাস শিস কাটছিল। কখনো জোরে, কখনো ঝিমধরা অবসাদগ্রস্ত। চাপা একধরনের ভঙ্গিতে কেউ যেন বোবা কান্না ছিটিয়ে নেচে বেড়াচ্ছিল এই শ্মশানের চারপাশে। বিভিন্ন দিক থেকে উঠে দাঁড়ান প্রাচীন ঠাণ্ডা কবন্ধ বুকের মতো চারটে ভাঙা চোরা দেওয়ালের মাঝে বসেছিল তারা। দক্ষিণ প্রান্তের একটা ভাঙা হাটকরা নিচু দরজা দিয়ে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছিল সামনে। তার আলোয় সবারই চোখে পড়ল ক টুকরো পোড়া কাঠ, কাঁটাগাছ, খুরি কলসির কানা, ভাঙা কাঁচের চুড়ি, একপাশে জড় করা কিছু ধবল নদীর শামুক, শুকনো বট পাতা ঝরে পড়ছিল।

পিছনে ধ্বসনামা খিলানের ছায়া। মশা আর জোনাকীর মাঝখানে তারা বসেছিল গোল হয়ে। দূরের তালগাছে শকুনের কান্না আর মাঠে শিয়াল কুকুরের ডাক ছাড়া অন্য কোনো শব্দ ছিল না যাতে তারা সাহস ফিরে পায়। চতুর্দিকেই যেন সেই অনাদি অনন্ত "দক্ষিনের দরজায় যেয়ো না" গোছের উৎকণ্ঠিত অপেক্ষা।

মাথার উপরে মন্দিরের হাঁ-করা মুখ জুড়ে পরিব্যাপ্ত কঠিন আকাশ, নক্ষত্রের ম্লানতম আলোয় চাঁদ খেলা করছিল, জ্যোৎস্না প্লাবিত নীল বাতাস-বাজান নিশুতি কোলাহল। পোড়ো অন্ধকারে তিনজনের মুখ অস্পষ্ট আলোয় জ্বলছিল। কালো সুগঠিত কোনো পাশ, একচোখের শাদা পাতা, কপালে

শিরা, ভাঁজ, ঝুঁকে পড়া বাঁকানো চোয়াল, চিবুক, কণ্ঠার মোটা শিরা আবছায়া ছিন্নভিন্ন ছবির মতো ভাসছিল শূন্যে।

—এ একরকম ভালই হলো, হাঁটতে ভালো লাগছিল না আর। একজন মুখের ঘাম মুছতে মুছতে অস্ফুট কাতরক্তি করল হঠাৎ।

—যা বলেছিস। সারা গায়ে আগুন জ্বলছে এখন, স্নান করে আসি নদীতে। বলে অন্যজনা তার শিরা টানা হাত তুলল মাথায়।

তখন তাদের চারপাশে মাঠ ঘাট, শ্মশান, ছায়াঘেরা পথ, জলা-জোনাকী, মশার একঘেঁয়ে কান্নার শব্দে ঘুরছিল। নীল জ্যোৎস্না। ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে ওঠা বোবা বাতাসে হাহাকার, হাহাকার ব্যাপ্ত চারিধারে সেই অপ্রাকৃতিক গল্প বিস্ময়ের অবরোধ, সব পথে যেয়ো কিন্তু দক্ষিন নিষিদ্ধ।

অথচ তাদেরই একজন দক্ষিণের নীল চৌকাঠ পার হয়ে নদী পথে নেমে গেল একা একা।

নদী তীরের দৃশ্যের উপর বড় ঐশ্বর্যময় জ্যোৎস্না টাল খেয়ে পড়েছিল তখন। বিশাল বৃক্ষসারি, মরাগুঁড়ি, তালবন অলৌকিক বিশাল আকাশের নিচে স্বপ্নের মধ্যে জেগে উঠছিল ধীরে ধীরে। কেমন অলস চোখ টান করা কতকগুলো অতিক্লান্ত ভারি শরীরের মতো। বন চাঁপার উগ্র গন্ধে বিস্ফারিত বাতাসে শ্বাস নেবার সময় মানুষটার সারা বুক খাঁ খাঁ করছিল থেকে থেকে। ধীর পরিশ্রান্ত ঢঙে টলে টলে নদীর উপর দিয়ে হাঁটছিল সে। পা বসে যাচ্ছিল মিহি বালির মধ্যে। বেশ কষ্ট হচ্ছিল হাঁটতে, তবু কি এক দুর্বোধ্য আকর্ষণ তাকে নিশি পাওয়া মানুষের মতো টেনে নিয়ে যাচ্ছিল সামনে। বুঝি কোন আস্থিকালের ঘুম ভাঙার পর চোখ খুলেই চারপাশ দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল নিমেষে। সাতরাজ্যির রঙ-তামাশা ঘন হয়ে জমল দু চোখ জুড়ে। মন্ত্রপূত জলে মায়া ঢেলে দিয়েছিল নজর ভরে।

শরীর আর বইছিল না তার, হাতপাগুলো সব খুলে পড়ছিল যন্ত্রণাতে, অবসাদে মাথা বুকের মাঝখানে ঝুলে পড়ছিল। ঘাড় তুলে চাইবার সাধ্যটুকুও লোপ পেয়ে গিয়েছিল অনেক আগে। তবু একটা নেশা ছিল যেন হাঁটার মধ্যে। অপ্রাকৃতিক দৃশ্যের গোপনতম মায়ার স্বাদ নিবিড় হয়ে মিশে যাচ্ছিল স্নায়ুর সঙ্গে। বড্ড ভয়ানক সে জ্যোৎস্নাধীন প্রকৃতি, আলো ভাসা মাঠ, ফল-ফসলের বাতাস তাকে নিঃশেষে গ্রাস করে নিয়েছিল সেই সময়। জলা,

ঝোপ, শ্মশান, গ্রাম, মরাগুড়ি, পুরাতন বট, ভাঙ্গা বিবর্ণ দেওয়ালের গা ধরে ঝুলে পড়া ফাঁপা মেঘখণ্ড, চাঁদ, ঝড়ো মগ্ন বালিয়াড়ির টানে দিশাহারা হয়ে পড়েছিল মনপ্রাণ।

বিশ্বসংসার তখন স্বপ্নময় অপলক চোখ খুলে সেই মানুষটাকেই দেখছিল কেবল। জন্মের পূর্বক্ষণের যাবতীয় বিস্ময়, আশঙ্কা, যন্ত্রনা, প্রেম, মোহ, এক একাকার হয়ে জমেছিল তার চোখে। আর সেই হতবাক্ দৃষ্টির উপর দিয়েই সে দৃশ্য থেকে দৃশ্যের গোপনতম উৎসের দিকে চলে যায় একা একা। শরীর ছেড়ে মনটাই যেন ছড়িয়ে পড়েছিল কাশবন, কেন্দুগাছ, আকন্দ মাদার ঝোপের আনাচে কানাচে, ঘুমন্ত পাখীর পালকে, শরীরের রঙে।

বালির উপর পা টেনে শ্লথ অবসন্ন বেহুঁশের মতো নেমে যাচ্ছিল সে। সম্মুখে পশ্চাতে সেই অলৌকিক আলোমাজা পটভূমি জুড়ে মধ্য নিশীথের চাঁদ আরো বেশি অপ্রাকৃতিক হয়ে উঠেছিল ধীরে ধীরে। ঢেউএর শিথিল জলরেখায় পুঞ্জপুঞ্জ আকাশ, মেঘ ভেঙে পড়েছিল। দু চোখ টান করে টলোমলে অবশ গতিতে সেদিকেই চলে যাচ্ছিল মানুষটা। দু পা পাথরের মতো শক্ত ভার ভার, ঘাম আর শুকনো বালির আঁচড়ে হাঁটুর চামড়া ছিঁড়ে পড়ছিল, কপালের মোটা নীল শিরা উঠে এসেছিল সামনে। কাঁধের কাপড় দিয়ে হাতমুখের ঘাম মুছল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। নদীপারের ডালপালা পাতার ফাঁকে বুনোফল চকচক করছিল পাতলা কাঁচের মতো অবিকল। মনে হচ্ছিল দামাল হাওয়ার এক টানে চুরমার হয়ে পড়বে এখুনি। নদীবক্ষে পড়ে থাকা কখণ্ড মেটে রঙের পুরনো ফাটা হাড়ের পাশ কাটিয়ে চলে যাবার আগে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল একবার।

ফুলে ফুলে বড় অদ্ভুত হয়ে উঠেছিল স্তূপাকার আকন্দের ঝোপঝাড়। মধ্যিখানে প্রায় ন্যাড়া কল্কে গাছের একদিক গুচ্ছের হলুদ ফুলে আগুনের মতো দপদপ করে উঠছিল। কোথায় রাতচরা পাখীর ডাকে চমকে বোকা মুখ তুলে চারপাশে তাকিয়ে কিছুই চোখে পড়ল না তার। কেবল শব্দটা টাল খেয়ে ডুবে গেল অন্ধকারে। ডান দিকে ঝুপসি শাল সেগুন বনের মাথায় বড় তারাগুলো কিছুটা আরো হেলে পড়ে এলিয়ে নদীর দিকে পাশ ফিরে ছিল। মেঘের ছায়ায় ডুবে যাওয়া পরপারের নিঃশব্দ অন্ধকার ভেদ করে ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীর শিরশির করে উঠছিল বারবার।

একটু এগিয়ে বাঁ দিকে একটা ছোট্ট বালির স্তূপ। তারই পাড় ঘেঁষে

অপরিসর অতল দহের কালো জলে তারা, আকাশের নীল ছায়া দাঁড়িয়ে ছিল। জলে নামা দুধ সাদা শরীরের মতই একফালি মেঘ ঝুঁকে ছিল মাথার উপরে। ছোট বড় নুড়ি, ভারি পাথর ছড়ান নদীপারের ধূ ধূ মাঠে, ঢ্যাঙ্গা সারিসারি তালগাছের গায়ে জড়ান ছায়া ছায়া অন্ধকারে নির্বাক থমথমে হয়ে উঠছিল সব দিক।

ঘাটের পাশে এক খণ্ড বড় পাথরের উপর বসে পড়ল সে, নিঃশ্বাস নিল টেনে টেনে, ভিজে হাওয়ার ঝাপটায় বুঝি হাহাকার করে উঠল তার বুক। ঘাম শুকিয়ে নুনবালি জমা আঠালো কপাল ঘসল ডানহাত তুলে। এক দৃষ্টিতে জ্যোৎস্না ভেদ করে চেয়েছিল আদুর বুক খোলা ছায়াময় তাজা নরম মাঠের দিকে। জনমানুষ ছিল না কোথাও। মাঠ বাদাড় ঠেলে ছুটে আসা চাপা গন্ধে সারা বুক কেমন উদাস খালি মনে হয় তার। দমকা দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে বুক চিরে। বোবার মতো সামনের খই ফোটা চাঁদের আলোয় বুকের অতলে ডুব দিয়েও সহসা কূল পায় না সে।

পিছনের লম্বা শরবন সেই বাতাসে আকুল হয়ে দুলছিল আপন খেয়ালে। শাঁই শাঁই শব্দটাই কেবল বুকের রক্ত শুষে নিচ্ছিল একটানা। তার চওড়া মোটা হাড়ের দু হাত প্রার্থনার ঢঙে বুকের উপর আড়াআড়ি নামান। রূপোলি অজস্র পালকের মতো শরবন, কাশপাতা জ্বলজ্বল করছিল চোখের সামনে। অবিকল আশ্চর্য শাদা হাঁস যেন দু ডানা প্রসারিত করে শুয়েছিল বালির উপরে, মেলে ধরা পালকের রঙ নিশুতি থমথমে জ্যোৎস্নায় কাঁপছিল থরথর করে।

আচমকা কি এক চাপা শব্দে ভয়ে হিম হয়ে গেল সারা দেহের রক্ত। ঠাণ্ডা অনুভূতিতে জমে শক্ত হয়ে উঠল মস্ত ছাতিটা। সন্দিগ্ধ আশঙ্কিত চোখ ঘুরিয়ে জনমানুষ তো দূরের কথা কোনো রাতচরা জন্তুর ছায়াটুকুও নজরে পড়ল না তার। খালি বালির উপর গাঙ-শালিখের পায়ের দাগ এলোমেলো পাক্ খেয়ে দূরের জ্যোৎস্নায় ডুবে গেছে দেখল। আতঙ্কে পাতলা পাতার মতো নড়ে উঠল পাজরের ভিতরটা। বালির উপর গুঁড়ি মেরে কুঁজো জানোয়ারের মতো হাঁটু ঘসড়ে ঘসড়ে শরবনের ঠিক পিছনে এসে দাঁড়াল সে। বেশ কিছুক্ষণ ঠায় শরীর টান করে বোঝার চেষ্টা করল। আর সঙ্গে সঙ্গে চাপা মিহি গলায় গোঙ্গানীর মতো রুদ্ধস্বর হাওয়ায় জড়িয়ে কেঁপে উঠল ঠিক দু কানের পাশে। মেয়েলি কান্নার মতো একঘেয়ে আর একটানা

স্বর তুলে কঁকিয়ে উঠছিল কেউ। ঠিক বুকের কাছে উঁচু ঘন শরবনের পিছনে যেন কেউ মরণ যন্ত্রনায় কাতরাচ্ছিল পড়ে পড়ে। আরো ঝুঁকে কুঁজো হয়ে দু হাতে সাবধানে শরপাতা সরিয়ে যা চোখে পড়ল তাতে বুকের জমাট রক্ত লাফিয়ে উঠে এল মাথায়। আতঙ্কে বিলকুল থ গেল মেরে মানুষটা দশ হাত হয় কি না হয়, এমনি দূরত্বে নরম বালির উপর মুখ গুঁজরে পড়ে থাকা সোমথ মেয়েমানুষকে কুঁকড়ে আর্তনাদ করতে দেখলে কার বুকের রক্ত না জল হয়ে যায়। আদুর গা হাত পা। তেলচিটে ছেঁড়া নোংরা কাপড়টুকু একটা গাছের নিচু ডালে আটকে ঝুলছিল। তার ছায়ায় ঢাকা পড়েছিল মুখের একপাশ, টান করা দুপা ধনুকের মতো দুমড়ে বেঁকে ছিল কঠিন হয়ে। কোথায় ডালের পিছন থেকে রাত-চরা পাখি ডাকছিল কুপ কু…প করে। আর কোনো শব্দ ছিল না আশে পাশে।

ডানহাতের মুঠোতে গুচ্ছের শরপাতা মুচড়ে ধরে টেনে টেনে দম ফেলল সে, বুকের মাঝখানে চাপা আতঙ্কে থম মেরে উঠেছিল তখন। শরগাছের বেড়া পার হয়ে দু চোখ পাকিয়ে দেখল কিছুক্ষণ। মরে যায় নি তো রে বাবা। কিন্তু না মরে নি। পায়ে পায়ে একদম শিয়রের পাশে গিয়ে দাঁড়াল মানুষটা, ফ্যালফ্যাল করে আহাম্মকের মতো চেয়ে রইল ঠায় দাঁড়িয়ে। মরে নি, ক্লান্ত শিথিল ভারি শরীরটা কিসের যন্ত্রনায় টান করে পড়েছিল পায়ের তলায়। দু হাত মাথার পাশে ছড়ান, বিকৃত মুখে চাঁদের আলো পড়ে ক ফোঁটা ঘাম চিকচিক করছিল, বিস্ফারিত দু চোখের পাতা রুদ্ধশ্বাস চাউনি মেলে কাঁপছিল, আর দু কষ ভেসে গড়ান লালার সঙ্গে এক থামচা বালি মাখামাখি হয়ে ছিল গালের একদিকে। তামাটে কচি ছোট্ট চিকন কপালের উপর রুক্ষ চুল উড়ছিল, বালির উপর মুচড়ে ধরা ডান হাতে আঁচড় কাটছিল। তাকে দেখতে পেয়েই কেঁপে ওঠা দু ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে আঁ…আঁ…করে উঠল কয়েকবার। এক নিমেষে জলের মতই স্বচ্ছ হয়ে গেল সমস্ত ব্যাপারটাই।

—ওমা, ইকি কাণ্ড রে বাবা। এই আস্থায় পথে বার হয় মানুষে, এঁ্যা, এই এখন তখন হাল শরীরের।

বলে চাপা স্বরে ধমকে ঝুঁকে পড়ে যেন বোবাটে মেরে গেল আবার। সর্বনাশ। বিলকুল সাদা ফাঁকা চওড়া সিঁথিতে সিঁদুরের ছিটে ফোঁটা নেই কোথাও।

—বিয়েও হয় নি, বাপরে।

বিস্ময়ে ভয়ে মাঝপথেই কেঁপে উঠল স্বর। আর জবাবে মেয়েটার যন্ত্রণা আচ্ছন্ন ঠোঁটের এককোণ বেঁকে কেমন একফালি শেষরাত্তিরের চাঁদের মতো নিস্তেজ হাসি জ্বলে উঠল একবার। ক্রমশ নীল হয়ে উঠতে লাগল সারা মুখের রঙ, বালিতে ছড়ান ডানহাত আড়ষ্ট ঢঙে টলে পড়ল ঘাড়ের পাশে, বড় বড় ভাবাহীন ঢলঢলে দুচোখ ঘিরে শ্রাবণের বাড়বাড়ন্ত মেঘের মতই অলস গভীর হয়ে উঠেছিল ডাগর কালো তারা দুখানি। শ্বাসরোধকারী সেই জন্ম সময়ের এক পরমাশ্চর্য অপেক্ষায় মেয়েটার কোমরের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে থাকা মানুষটার দু-হাতের সব পেশী শক্ত কঠিন হয়ে উঠল ক্রমে ক্রমে। রক্ত-মাংসের অন্ধকার থেকে উঠে আসা মূলকে আলোর সামনে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দেবার উদ্যোগে সর্বশরীর শিটিয়ে উঠেছিল তার।

পূর্বাকাশে তাজা একফালি আলোর ফিনকিতে ভোররাতের বড় তারাটা দপদপ করছিল দুজনের মুখোমুখি নেমে এসে। ঝলকে ঝলকে ছুটে আসা ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়া শিরশির করছিল শরীরের টানাটান চামড়ার পিঠে। বিস্ময়কর কোনো উত্তেজনায় দু-হাত সামনে মেলে মানুষটা সময় গুনছিল বসে বসে। আর জ্যোৎস্নাময় নদীতীর, নক্ষত্র সাজান পরিচ্ছন্ন আকাশ, মাঠ থেকে ঝাঁপ দেওয়া ফসলের গন্ধ, অস্ফুট হাওয়ার শব্দ, বালির বুকে গা-জাগা সবুজ রোদ্দুরে গ্রামগন্ধের পরিচিত বিস্ময়বোধে তার সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে এসেছিল। অপেক্ষমান ডানার গন্ধে আচ্ছন্ন বাতাসে বসে থেকে আচমকাই তার মনে পড়ল, কোথাকার পালাগানের আসরে এক পাগলা কবিয়ালের ছড়ায় এমনি একটা কথাই শুনেছিল সে, যে এই বাতাসই নাকি সমস্ত ফুলের কুঁড়ি খুলে ফেলার জন্যে ডালে ডালে কাঁপাতে থাকে তাদের।

ভারতের প্রতিরক্ষা শিল্প

সুনীল সেন

ভারতের প্রতিরক্ষা শিল্প সম্পর্কে অধুনা যে আগ্রহ এবং উৎসাহ দেখা যাচ্ছে, তা স্বাভাবিক। মাতৃভূমির স্বাধীনতা এবং অখণ্ডতা রক্ষার জন্য প্রতিরক্ষা শিল্প এবং উৎপাদনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বাস্তবকে উপেক্ষা করে অর্থনৈতিক অনুসন্ধান পরিত্যাজ্য; মনে হয় অনুসন্ধানের ফোকাস্ পরিবর্তনের প্রয়োজন রাখে। প্রারম্ভে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করে এই প্রশ্নের আলোচনা শুরু করা যেতে পারে। ব্রিটিশ শাসনের যুগে প্রতিরক্ষা শিল্প বৃহদায়তন হতে পারে নি কেন? স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে প্রতিরক্ষা শিল্প কোন পথে অগ্রসর হয়েছে এবং কতটা প্রসার লাভ করেছে? প্রতিরক্ষা শিল্প স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পেরেছে কি? এই লক্ষ্য পূরণে বাধা কি, সমস্যা কি? উত্থাপিত প্রশ্নগুলির আলোচনায় ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার আশ্রয় অবশ্যই নিতে হয়।

প্রতিরক্ষা শিল্পের প্রতিষ্ঠা

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের প্রতিরক্ষা শিল্পের প্রতিষ্ঠা; এই পর্বেই স্থাপিত হয় ফতেগড়ের গান-ক্যারেজ কারখানা (১৮১৮) এবং দমদম ও কাশীপুরের অর্ডন্যান্স কারখানা (১৮৪৬)। বিংশ শতকের গোড়ায় তেরটি যুদ্ধাস্ত্র নির্মানের কারখানার উল্লেখ পাওয়া যায়; এই কারখানাগুলিতে নিযুক্ত মজুরের সংখ্যা প্রায় তের হাজার। ১৯০৭ সালে ইছাপুর (ইসাপুর) কারখানায় রাইফেল নির্মাণের শুরু।

বোধহয় বলা বাহুল্য, প্রতিরক্ষা শিল্প তখন অতি ক্ষুদ্রায়তন থাকে; প্রতি বৎসর 'অর্ডিন্যান্স স্টোরস' খাতে ভারতের মূল্যবান স্টার্লিং বিলাতে জমা হয়। ইণ্ডিয়া অফিসের মারফত 'অর্ডিন্যান্স স্টোরস' আমদানি করতে হতো। অর্থনীতিবিদগণ এই বিরাট অর্থনৈতিক 'ড্রেইন'-এর অনুসন্ধান করলে দেখতে পাবেন, ভারতের দুর্বল আর্থিক ব্যবস্থার উপর কি প্রচণ্ড চাপ এর ফলে

সৃষ্টি হয়েছিল। অর্ডন্যান্স কারখানার যাবতীয় সাজসরঞ্জাম এবং মেশিনগান, কার্টরিজ, বন্দুক বিলাত থেকে -আমদানি হতো। ভারত ছিল বিলাতী অস্ত্রনির্মাণ কারখানার বিরাট বাজার। এই অর্থনৈতিক 'ড্রেইন'-এর সামান্য হদিস মেলে 'অর্ডন্যান্স স্টোরস' বাবদ যে টাকা বিলাতে পাঠানো হতো, তার হিসাব থেকে। এই হিসাব এইরকম :

বৎসর	পাউণ্ডে মূল্য
১৮৮৩-৮৪	১৬৩,৯০২
১৮৯৯-১৯০০	১৮৯,৮৩৪
১৯০৪-০৫	১,১৪২,৫৪৬
১৯০৯-১০	২৪৯,২২৫
১৯১৩-১৪	৫০০,৩২৮

(Accounts of the Home Treasury থেকে সংগৃহীত)

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, প্রতিরক্ষা শিল্পের ভিত মজবুত করে এই বিরাট ব্যয়, স্টার্লিং-এর অপচয় কমানোর (বন্ধের নয়) প্রচেষ্টা হলো না কেন? অর্ডন্যান্স বিভাগের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এই বিষয়ে বারবার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, এবং তাঁদের জোর সুপারিশের ফলেই ভারত-সচিব কাশীপুরে ইস্পাত উৎপাদনের এবং রাইফেল নির্মাণের ব্যবস্থায় শেষ পর্যন্ত সম্মতি দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত বলে রাখি, কাশীপুরেই সর্বপ্রথম ভারতে ইস্পাত উৎপাদনের পরীক্ষা সাফল্য অর্জন করেছিল। সামরিক প্রয়োজনের বাস্তব সমস্যা শাসকশ্রেণী একেবারে উপেক্ষা করতে পারেন নি।

যুদ্ধের ধাক্কা

সামরিক প্রয়োজন উপেক্ষা করা সত্যই বড় কঠিন। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর্বে এই প্রয়োজনের মোকাবিলা করতে হলো। ভারতে ভারি শিল্পের অনগ্রসরতা এবং যুদ্ধাস্ত্রের জন্য বিদেশের উপর বিপজ্জনক নির্ভরশীলতা—এই রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখী হয়ে শাসকশ্রেণী 'লাস্যা ফেয়ার' বা 'যদৃচ্ছা চলা' নীতিতে অবিচল থাকতে পারলেন না। করে ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্যোগে

ভারি শিল্প এবং প্রতিরক্ষা শিল্প গড়ে উঠবে, তার জন্য সমস্যার সময় বা সুযোগ আর ছিল না। এই প্রসঙ্গে লেনিনের সুবিখ্যাত উক্তি মনে পড়ে :

"সব যুধ্যমান রাষ্ট্রই এক নাগাড়ে কতকগুলি রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে, যার প্রায় প্রত্যেকটিই জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে, এমন ধরনের সব সংস্থা সৃষ্টি ও লালন করে যাতে সরকারের প্রতিনিধিরা অংশীদার, যার উপর জারি থাকে সরকারি তত্ত্বাবধান।"

(সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯০)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর্বে ভারত সরকার অর্ডন্যান্স কারখানাগুলির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। ১৯২০ সালে স্থাপিত হয় ইছাপুরের মেটাল এ্যাণ্ড ষ্টিল ফ্যাক্টরি, অধুনা যে কারখানা আরো বৃহদায়তন হয়ে ভারতের প্রতিরক্ষা শিল্পের গৌরব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর্বেও দেখা গেল এই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে সরকার প্রতিরক্ষা শিল্প গড়বার কাজে "কিছু না করবার"-নীতিতে অবিচল রইলেন; তখনো ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্যোগের উপর তাঁদের প্রচণ্ড আশা। ১৯৪১ সালে ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সামরিক প্রয়োজন পূরণের জন্য সচেষ্ট হলেন। অর্ডন্যান্স কারখানাগুলির সম্প্রসারণের জন্য চার কোটি টাকা বরাদ্দ হলো : জামালপুর, প্যারেল, কাঁচরাপাড়া, লিলুয়া প্রভৃতি রেলওয়ে ওয়ার্কশপগুলিকে প্রতিরক্ষা শিল্পের প্রয়োজন মেটাতে লাগানো হলো (ইণ্ডিয়ান ইনফরমেশন, অক্টোবর, ১৯৪১)। ঐ বৎসরের আগস্ট মাসে ব্যাঙ্গালোরের হিন্দুস্থান বিমান কারখানা বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানি করে প্রথম বিমান তৈরি করল। অনেকের হয়তো মনে পড়বে, সেদিন অনেক ফলাও করে এই সংবাদটি প্রচারিত হয়েছিল।

স্বাধীনতার পরে

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে স্বভাবতই ভারত সরকারকে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে হয়েছে। প্রতিরক্ষা শিল্পে ভারতের অগ্রগতির মূল্যায়নে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার পটভূমি স্মরণীয়; মনে হয় এই পটভূমি পরিকল্পনা রচয়িতাদের প্রভাবিত করেছে। প্রতিরক্ষা শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতীয় পরিকল্পনার দুটি স্তম্ভ : এক, বিদেশের উপর বিপজ্জনক নির্ভরশীলতা কাটিয়ে এই শিল্প হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ, এবং দুই, এই শিল্পে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ প্রধান

ভূমিকা পালন করবে। ব্যক্তিগত মালিকানার ধ্বজাধারীরা যাই বলুন, তাদের হাতে এই শিল্প সঁপে দেওয়া বিপজ্জনক। আমেরিকা ও ইউরোপের দৈত্যাকায় কারখানা Du Ponts, Krupps, Vickers, Schneider প্রভৃতির স্থান ভারতে নেই। ইতিহাসের ছাত্রদের জানা আছে, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী পর্বে এই কারখানা-মালিকদের চক্র যবনিকার আড়ালে কি ভাবে অবিরাম যুদ্ধচক্রান্ত চালিয়ে গেছে। পণ্ডিত নেহেরু এই চক্রের কার্যকলাপের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন :

"এরা হচ্ছে নরহত্যার পাইকারি ব্যবসাদার; এদের মৃত্যুবর্ষী যন্ত্রপাতি এরা অপক্ষপাতে যে টাকা দেবে তাকেই বেচতে রাজী।…বিভিন্ন দেশের এই রণসজ্জা নির্মানের কারখানাগুলোর পরস্পরেরর মধ্যে নিবিড় যোগ আছে। এরা দেশপ্রেমকে ক্ষেপিয়ে তুলে কাজ হাসিল করে, মৃত্যুকে নিয়েই এদের খেলা।…এদের গুপ্তচরেরা প্রত্যেক দেশের উর্ধ্বতন কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক মহলে ঘোরাফেরা করে।"

(বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ)

আমাদের সৌভাগ্য, ভারতে এই চক্র গড়ে উঠতে পারে নি; ভারতের শিল্পনীতি (ইণ্ডাসট্রিয়াল পলিসি রিজোলিউশন, এপ্রিল, ১৯৫৬) এদের পথে বাধা। ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্যোগে আমাদের দেশে অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের বৃহদায়তন কারখানা স্থাপিত হতে পারবে না; প্রতিরক্ষা শিল্প রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে গড়ে উঠছে এবং উঠবে।

অবিচলিত আস্থা নিয়ে প্রতিরক্ষা শিল্পকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে ভারত সরকারের উদ্যোগ লক্ষ্যণীয়। ১৯৬০-৬১ সালে অর্ডন্যান্স কারখানাগুলিতে তৈরি বিবিধ স্টোর্সের মূল্য দাঁড়ায় ৩০.৩৬ কোটি টাকা; আগের বৎসরে এর পরিমাণ ছিল ২৫.১৪ কোটি টাকা। অর্ডন্যান্স কারখানাগুলি তৈরি করে বন্দুক, মেশিনগান, ভারি মর্টার, বোমা, প্যারাসুট, বস্ত্রদ্রব্য ইত্যাদি; বিবিধ যন্ত্রপাতি তৈরি হচ্ছে মহারাষ্ট্রের Machine-tool Proto-type Factory এবং ব্যাঙ্গালোরের কাছে স্থাপিত ভারত ইলেকট্রনিকস্ কারখানায়; বিমান নির্মাণে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে ব্যাঙ্গালোরের কারখানা। প্রযুক্তি-বিদ্যায় পুরানো দুর্বলতা সত্ত্বেও দেশে গড়ে উঠছে দক্ষ শ্রমিকের বাহিনী, যার গুরুত্ব সময়ে প্রতিভাত হবে। প্রতিরক্ষা শিল্পের অগ্রগতির ফলে ইতিমধ্যেই বিদেশ থেকে যে 'অর্ডন্যান্স স্টোর্স' আমদানি হতো,

তার পরিমাণ কমেছে এবং প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা বেঁচেছে। বিগত পাঁচ বৎসরের 'অর্ডন্যান্স স্টোর্স' আমদানির হিসাব নিচে দেওয়া হলো :

বৎসর	লক্ষ টাকা
১৯৫৭	১৮,৫৩
১৯৫৮	৪,০২
১৯৫৯	৭৪
১৯৬০	৩,২৭
১৯৬১	৩৫

(India, 1962 থেকে সংগৃহীত)

এই সব হিসাব থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, ভারতের প্রতিরক্ষা শিল্প তার লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, আর তার ফলে বিলাতের অস্ত্রনির্মাণ কারখানাগুলির পক্ষে লোভনীয় পুরনো দিনের ভারতীয় বাজার সংকুচিত হয়েছে। তাই কি "বিতাড়িত" প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কৃষ্ণ মেনন বিশেষ মহলের বিশেষ আক্রমণের কেন্দ্র? ভারতের প্রতিরক্ষা শিল্পকে পঙ্গু করে রাখা হয়েছে বলে যে প্রচার শোনা গেছে তা মুখ্যতঃ অজ্ঞতাপ্রসূত কিংবা অভিসন্ধিমূলক বলেই মনে হয়। বাস্তবকে অতিরঞ্জন বা বিকৃত না করে আমাদের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু লোকসভায় ১৪ই নভেম্বরের বক্তৃতায় (যে বক্তৃতা নানা কারণে ঐতিহাসিক হয়ে থাকবে) বলেছেন :

"We did build up, I think fairly adequately, our armament industry, not as much as we could have liked. It was being progressed.···It has grown about 500 per cent."

ভবিষ্যৎ লক্ষ্য

বলা বাহুল্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে আমাদের প্রতিরক্ষা শিল্পের এখনো অনেক বাকী। কিন্তু নিঃসংশয়ে বলা চলে, ১৯৪৭ সালের তুলনায় প্রতিরক্ষা শিল্প অনেক বেশি শক্তিশালী ; বর্তমানে ভারতীয় শিল্প, বিশেষ করে ভারি শিল্পের ভিত পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি মজবুত। ভারি শিল্পের শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে প্রতিরক্ষা শিল্পের আরো অগ্রগতির সম্ভাবনা আজ

বাস্তব, তা ভাববিলাস নয়। বিশেষ মহলের অবিশ্রান্ত প্রচারের প্রচ্ছন্ন লক্ষ্য বোঝা কঠিন নয়। এদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য ভারতের শিল্পনীতি, যা প্রতিরক্ষা শিল্পকে রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্প হিসাবে বিকশিত করা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ করার নীতির উপর দণ্ডায়মান। বহুনিন্দিত কৃষ্ণ মেননের একটি প্রবন্ধ থেকে কিছু উদ্ধৃতি অপ্রিয় হলেও, বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না :

"There are those who cavil against planning not only for ideological reasons, but against our development measures. They light heartedly argue that the resources and the strength of the nation have gone into social services or industrial development and thus starved defence resources! We have to tell our people, without timidity, that defence, even into goods, are less available from its own resources to a nation and that external resources are less patent in serviceability if we are not progressive in production and development."

(লিঙ্ক, ২৭শে জানুয়ারি)

দ্রুত শিল্পায়ন, বিশেষ করে ভারি শিল্পের বিকাশের পরিকল্পনাকে রূপায়িত করে প্রতিরক্ষা শিল্পকে শক্তিশালী করা সম্ভব, সেই পরিকল্পনাকে কুবরস্থ করলে প্রতিরক্ষা শিল্পের পঙ্গু হয়ে থাকবারই সম্ভাবনা। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা বোধহয় এই শিক্ষাই দেয়।

ডাক বাংলার ডায়রি

সুবচনী

লাল মাটি

'মালপত্তর সব সাবধান। চোর এই কামরাতেই আছে।'—

পোস্টাপিসে দশটা-পাঁচটা কলম পিষে, দু জায়গায় ছেলে পড়িয়ে, বৈঠকখানার বাজারে বাস্তুপুজোর বাজার সেরে স্টেশনে পা দিতেই শেষ লোকাল ছেড়ে যাওয়ায় সাতাশ-আটাশ বছরের যে ছোকরাটি অগত্যা আমাদের ট্রেণে উঠে পড়ে ঘুমে ঢুলছিল, হঠাৎ চেকারবাবুর গলা শুনে সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

'অন্যমনস্ক হয়েছেন কি ঐ য-যা: হয়ে যাবে'—চেকারের বক্তৃতা শুনে সবাই একটু সামলে-সুমলে বসল। ওপরের বাঙ্কে এক মোটা ভদ্রলোক তুড়ি দিয়ে সশব্দে হাই তুলতে তুলতে বললেন, 'এর নাম গয়া প্যাসেঞ্জার।'

ট্রেণে ভিড় ছিল না। বেঞ্চির ওপর জুতোসুদ্ধ পা তুলে দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মাঝরাত্তিরে মাঝরাস্তার কোনো স্টেশনে লোকজনের ঠেলাঠেলিতে ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখি কামরার মধ্যে গিজগিজ করছে লোক।

ট্রেণটা নড়ে উঠতেই দরজা খুলে ভেতরে লাফ দিয়ে পড়ল এক বৈরাগী। বয়েস বেশি নয়। কুচকুচে কালো দড়িপাকানো চেহারা। মুখের মধ্যে চকচক ঝকঝক করছে এক জোড়া চোখ আর দু পাটি দাঁত। কিছুক্ষণ ধরে সমানে সে গজগজ করতে লাগল। আজকালকার ভদ্রলোকদেরও বলিহারি। এতক্ষণ সে পাশের কামরাতেই ছিল, সঙ্গে টিকিট না থাকায় চেকার ডেকে প্যাসেঞ্জাররা তাকে ধরিয়ে দিয়েছিল। ফলে, তাকে ষোল আনা পয়সা থামোথা দণ্ড দিতে হলো। এ অন্যায় ধর্মে সইবে না, কিছুতেই নয়। লোকগুলো ওলাউঠো হয়ে মরবে।

চোখ ঘুমে ঢুলে আসছিল। হঠাৎ একতারার আওয়াজ শুনে তাকালাম।

বৈরাগীর চোখদুটো বন্ধ। ভয় দেখাবার আঙুলটা দিয়ে তারের ওপর সে এখন মিষ্টি সুর তুলছে আর সেইসঙ্গে তন্ময় হয়ে গাইছে—

> হরি, তোমায় ডাকিবার
> আমার সময় কই?
> কোথা কে দিবানিশি
> আমি থাকি দিবানিশি কাজে মত্ত
> আমি তোমার তত্ত্ব ভুলে রই।
>
> হরি, সকালবেলায় মন করিলাম
> জপিব এখন,
> গোপাল এসে কোলে বসে
> জুড়িল ক্রন্দন।...
>
> দুপুরবেলায় স্নান করে যখন
> উঠিলাম ডাঙায়
> নাগরীগণ কলসী কাঁখে
> সম্মুখে দাঁড়ায়।
> দেখে ঐ রূপের বর্ণ
> হয়ে জ্ঞানশূন্য
> আপনা আপনি ভুলে রই।
>
> সন্ধ্যেবেলা আচমন করে
> গিন্নি এসে গর্জন করে...
> ক্রমে ক্রমে রাত্রি হলো
> দ্বিতীয় প্রহর।
> ক্ষুধার চোটে অঙ্গে ধরে কাঁপুনি
> বলে লক্ষ্মীকান্ত, চাল বাড়ন্ত
> কে আনিবে তুমি বই।...

শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

বোলপুরে যখন নামলাম, তখনও বেশ অন্ধকার। স্টেশনের হাতায় পোঁ পোঁ শব্দে হর্ন বাজাতে বাজাতে কণ্ডাক্টর চেঁচাচ্ছে: জয়দেব কেঁদুলি। জয়দেব কেঁদুলি।

চায়ের লোভ ছাড়তে না পেরে প্রথম বাসটা ছেড়ে দিতে হলো। দ্বিতীয় বাস ছাড়ল কড়া লিকারে দুধ পড়বার মতো করে যখন রাত ফরসা হলো। মেলা বাসে ঠাসাঠাসি ভিড়। জয়দেব অব্দি এমনিতে বাস চলে না। মেলা বলেই চলছে।

সুপুর, রায়পুর পেরোতে দুধারে খোয়াই আর তালডাঙা। রামনগরের পর চৌপাহাড়ি জঙ্গল। অফুরন্ত শালের বন। জঙ্গলের মধ্যে ছোট্ট গ্রাম বল্লা। বন শেষ হলে সুখবাজার। তারপর এক দমে ইলামবাজারে এসে বাস একটু দাঁড়াল। বড় বড় বাড়ি। পুরনো মন্দির। বেশ বর্ধিষ্ণু জায়গা। ডানদিকে ঘুরে গেছে রাস্তা। বাস চলতে লাগল। পায়ের, হরিষা, সুনমুড়ি ছাড়িয়ে উত্তরকোণা। সর্বক্ষেতে সবুজ হয়ে আছে মাঠ। বাস এবার বাঁ দিকে বাঁক নিল। মাঠরাস্তায় ধুলো ওড়াতে ওড়াতে খানিক পরে এসে থামল টীকরবেতায়।

নদীর ওপারের গ্রাম বেতা। এপারে টীকরবেতা। টীকর মানে উঁচু। কেঁদুলির সঙ্গে এ গ্রামের শুধু গোটা কয়েক মাঠের ফারাক।

আমার তেমন মোটঘাটের বালাই নেই। কিন্তু আমার বন্ধুটির আধমণী সুটকেস আর হোল্ড্অল। দুজনে ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে যেতে হলো। আমাদের কপাল ভাল, যে বাড়িটা চাইছিলাম সেটা হাতের কাছেই পেয়ে যাওয়া গেল। কড়া নাড়তেই বাড়ির কর্তা বেরিয়ে এলেন। আমাদের দিকে একটু অবাক হয়েই তাকালেন—'আপনারা ?' মনে মনে দমে গেলেও খানিকটা সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, কলকাতা থেকে।' যে অনুপস্থিত বন্ধুটির পরিচয়ের সূত্র ধরে আমাদের আসা, তাঁর নাম করে বললাম, 'চিঠি পান নি ?' 'কই, না তো।'—শুনে আরও মিইয়ে গেলাম।

অবশ্য আতিথেয়তার কোনো ত্রুটি হলো না। প্রথমে এল হাতমুখ ধোওয়ার জল, তারপর লোভনীয় চা-জলখাবার। কিন্তু আমাদের তখন হে-ধরণী-দ্বিধা-হও গোছের অবস্থা। ভাবছি একটা ছুতো করে দুপুরের আগেই অন্য কোথাও সরে পড়তে হবে। শুধু আধমণী সুটকেস আর হোল্ড্অলটার দিকে তাকিয়ে ঘাবড়ে যাচ্ছিলাম। ঠিক সেই সময় পিওন এসে বাড়ির কর্তাকে চিঠি দিয়ে

গেল। চিঠিটাতে চোখ বুলিয়েই তিনি বলে উঠলেন, 'দেখুন কাণ্ড, কবেকার লেখা চিঠি কবে এসে পৌঁছুল।' শুনেই বুঝলাম সেই চিঠি, যার অভাবে আমরা মরমে মরে ছিলাম।

সুতরাং খোশমেজাজে বেরিয়ে পড়া গেল মেলা দেখতে।

মাঠের আলরাস্তা ধরে গেলে কেঁদুলি মোটেই দূর নয়। কামারপাড়ার ভেতর দিয়ে রাস্তা গিয়ে পড়েছে মাঠে। হাতুড়ির ঠুক ঠাক আর হাপরের কাঁপা কাঁপা আওয়াজে গমগম করছে গোটা পাড়া। ঘরে ডাঁই হয়ে আছে বাসন, দাওয়ায় মহাজনের লোক বসে।

আলরাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখা যায় বাঁ দিকে খানিকটা দূরে সদর রাস্তা বরাবর সার দিয়ে চলেছে গরুর গাড়ি, মধ্যে মধ্যে বাসলরি আর তিন চাকার টেমেপা। দুপাশে খেজুর গাছগুলো ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধুলো খাচ্ছে।

সামনে আধডজন ধানকাটা মাঠ। তারপরই অনেকখানি জায়গা নিয়ে সিনেমার তাঁবু। জেনারেটরের শব্দে মাত হয়ে আছে সারা তল্লাট। লাউডস্পীকারে চল্ছে অবিরাম হিন্দী গান। কাঁটাতারের বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে একজন দাঁতন করছিলেন। বেড়ার এধারে দাঁড়িয়ে দুটো চারটে কথা হলো। ভ্রাম্যমান সিনেমা কোম্পানি ওঁদের। বর্ষার কয়েকটা দিনই যা বসে থাকতে হয়, বছরের বাকি সময়টা মফস্বলে সিনেমা দেখিয়ে বেড়ান। হিন্দী নাচগানের ছবি হলে তো কথাই নেই। বাংলা ছবিও চলে, তবে সুচিত্রা-উত্তমের বই হওয়া চাই। 'তবে আর বলছি কী, গ্রাম কি আর সে গ্রাম আছে, মশাই।' যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম তার ঠিক পাশেই প্রকাণ্ড একটা পোস্টারে এক রংদার মেয়ে বুক চেতিয়ে আড়নয়নে চেয়ে হাসছিল। তাকিয়ে দেখি বেড়াটার গায়ে লোক ভেঙে পড়েছে।

দু পা এগোতেই একেবারে মেলার আওতার মধ্যে এসে গেলাম। দোকান-পাট উপ্‌চে এসে পড়েছে মাঠে। স্তূপাকার হয়ে আছে দরজা-জানলার পাল্লা, গরুর গাড়ির চাকা, মাটির হাঁড়িকুঁড়ি, পাতকুয়োর পাটা।

রাস্তার দুপাশে সারি সারি দোকান। এক জায়গায় সাইকেল রিক্সায় বসে কোনো এক বিড়ি কোম্পানির লোক মাইকে জোর বক্তৃতা দিচ্ছে। তার পাশে পর পর দুটো হোটেল। উনুনে চায়ের জল ফুটছে। তার ঠিক পরেই টিম টিম করছে একটা হুঁকোর দোকান। হুঁকোর খোল আসে কোচিন

থেকে। আগে ছিল জমজমাট ব্যবসা। এখন গ্রামদেশে বিড়িটাই বেশি চলছে। বাইরে চলতে ফিরতে হুঁকো নিয়ে বড় ভজোকটো।

মোহন্ত বাবাজীর কাছ থেকে মেলার 'ডাক' হয়েছে এবার হাজার তিনেক টাকায়। দোকান করতে গেলে হাত হিসেবে ভাড়া। জায়গা বিশেষে তিন টাকা থেকে আট আনা হাত।

সংখ্যায় কাপড়ের দোকানই বেশি। খদ্দের বলতে বেশির ভাগই গাঁয়ের চাষী। এখন তারা ভালমন্দ বাছাই করতে, দরদস্তর করতে শিখেছে। বলে, 'অমুক ধরনের শাড়ি চাই।' ছাপা শাড়ির খুব চাহিদা। আগেকার দিনে? যা দেওয়া হতো তাই নিত। সাঁওতালরা আগে কিনত নিরেস ধরনের ছাপা রুমাল। এখন কেনে ভাল ক্যালিকো।

মনিহারি দোকানগুলোতে সাবান পাউডার পমেটম থেকে আরম্ভ করে নানা রকমের শৌখিন জিনিস। দেখে বোঝা যায় গ্রামের গায়ে শহরের হাওয়া লাগছে। খেলনার দোকানে যত খেলনা সবই প্ল্যাষ্টিকের,—কাঠের নয়, টিনের নয়, মাটিরও নয়।

অ্যালুমিনিয়মের দোকান দেখে মনে হলো লোকের কাছে এখন অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্রের চাহিদাই বেশি। এ চাহিদা সাধ করে নয়, দায়ে পড়ে। কাঁসাপিতলের দাম যা। অবশ্য স্থবিধেও আছে। খোয়া যাওয়ার ভয় কম।

মেলায় দোকান দেখতে হয় মিঠাইয়ের। থরে থরে ছাদ পর্যন্ত উঁচু ক'রে সাজানো। রঙেরও কত বাহার। শ' তিনেক দোকান। গড়ে পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকার বিক্রি। রসটুকুও ফেলা যায় না। তাই দিয়ে বোঁদে আর জিলিপি হয়।

নদীর ধারের রাস্তা জুড়ে কাতারে কাতারে বসে আছে কুষ্ঠরোগী। ভন্ ভন্ করছে মাছি। দেখে গায়ের ভেতর কেমন করে ওঠে। আরও একটু এগিয়ে গোটা ছুই বইয়ের স্টল। বটতলার বই। লক্ষ্মীচরিত্র। প্রেমের গোপন পত্র। রোজা হইবার সহজ উপায়। ভৈরবীতন্ত্র। যাছবিষ্ঠা। লতাপাতার গুণ। সেইসঙ্গে কৃত্তিবাসী সপ্তকাণ্ড রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত। আরও কত কী। যারা বই কিনবে তাদের এর ভেতর থেকেই পছন্দ করতে হবে। কেননা সব দোকানেই এই এক বই। কেন তারা শুধু বটতলার বইই রাখে? বটতলার বইওয়ালারা ওদের মোটা কমিশন দেয় যে।

পেন্ট করা সিনের সামনে কালো কাপড়ে ক্যামেরা ঢাকা দেওয়া ফটোর দোকান। এসেছে চিৎপুর থেকে। মেলায় মেলায় ছবি তুলে বেড়ানোই এদের কাজ। রোজগার? তা রোজগার না হবে তো আসবে কেন? আজকাল তো মরলে ফটো, বিয়ে হলে ফটো, বিয়োলে ফটো। কাল রাত্তিরেই তো এক গাঁ থেকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। টাকাও পেয়েছে ভাল।

তার পাশেই একজন পয়সা নিয়ে ম্যাজিক শেখাচ্ছে। তার পাশে কাটামুণ্ডু; মৃত্যুকূপ; বিদ্যুৎকন্যা; আজব চিড়িয়াখানা।

চব্বিশ পরগণা থেকে এসেছে মাছধরা জাল। নদীয়া থেকে আড়ি বা ধান মাপার ধামা। বর্ধমান, বৌবাজার, চালভাজা, খাঁপুর থেকে মাটির জিনিস।

মেলার শেষ প্রান্তে গিয়ে চক্ষু স্থির। গোটা পঞ্চাশেক কলার দোকান। জীবনে একসঙ্গে এত কলা কখনও দেখিনি। কলা নিয়ে এসেছে সতেরোটা ট্রাক। চন্দননগর থেকে, ব্যাণ্ডেল থেকে, কাটোয়া থেকে। একেক ট্রাকে গড়ে চার শো কাঁদি। একেক কাঁদিতে তিন পণ। বলতে গেলে এ মেলায় প্রায় সাড়ে ষোলো লক্ষ কলা বিকোবে। খবরের মতো খবর বৈকি। আগে এ অঞ্চলে কলা হতো না; এখন বাজার আছে দেখে চাষীরা করছে।

পৌষ সংক্রান্তির দিন আজ। গেরস্থরা লক্ষ্মীপুজো, পিঠেপরব নিয়ে ব্যস্ত। সাঁওতালদের বাঁধ্না পরব, পয়লা মাঘ ডোমহাড়িদের এথ্যানপুজো। মেলা কাল থেকে জমবে। লোকে জিনিস কিনবে ভাঙার মুখে। এখন দাম বেশির ভয়।

ছুপুরটা গড়িয়ে নিয়ে বিকেলে চা খেতে খেতে টীকরবেতায় আড্ডা বেশ জমল। পাড়ার এক বৃদ্ধ জয়দেবের মেলার গল্প বলছিলেন।

আগে ছু-তিনটে জেলার বিত্তবানেরা মিলে কেঁছুলিতে মচ্ছব করতেন। আখড়াও ছিল শতখানেকের ওপর। এখন বিশ পঁচিশটায় এসে ঠেকেছে। নতুন আখড়া বলতে শিরসার পশুপতি নায়েকের। তিন দিন ধরে খাওয়ানো; দিন ছুশো লোক খায়। দিনে একবার খাওয়া। সব আখড়া মিলে পাঁচ সাত হাজার লোক খায়। এর খরচ ওঠে কিছুটা জমিদারের দেবোত্তর সম্পত্তি থেকে, কিছুটা বারোয়ারি চাঁদা থেকে, কিছুটা গুরুর দৌলতে।

বৈষ্ণবদের মেলা তিন দিন। কিন্তু বছর চল্লিশ আগে একমাস ধরে বাজার থাকত। তখনকার দিনে বাজারে প্রধানত বিক্রি হতো মশলাপাতি,

তামাক, কাপড়, মনিহারি জিনিস আর চাষের যন্ত্রপাতি। এখন আর
তামাক আসে না!
সে সময়কার জিনিসের দাম? এখন শুনলে হাসি পাবে। দশ টাকায়
সম্বৎসরের তামাক, মশলাপাতি কেনা যেত। টাকায় জিরে পাওয়া যেত
আট সের, গোলমরিচ ছ সের, সুপুরিও ছ সের। একটা লাঙল চার আনা,
জোয়াল ছ আনা। তৈরি দরজা-জানলা তখন আসত না।
আমোদপ্রমোদ বলতে ছিল বৈঠকী গান। আসরে বসে কালোয়াতী গান
গাওয়া ভাগ্যের কথা ছিল। আর হতো বাউল গান। পরে বৈঠকী গান
উঠে যায়। সে সময়ে আসত কীর্তনীয়াদের দলের মূল গায়েনরা।
মেলায় ডিম মাংস বিক্রি হতো না। এখন ব্যবসাটাই প্রধান হওয়ায়
বৈষ্ণবেরা আড়ালে পড়ে গেছে। বৃন্দাবনী ছাপের কাপড় আসত জয়পুর,
বৃন্দাবন থেকে। এখন সে সব বন্ধ। কাপড় আসে এখন হাওড়ার হাট থেকে।
তেপাতি (তিন তাস), তের্স্ টি, ছক—এই নিয়ে সেকালে জুয়ো খেলা
হত খুব। এখন উঠে গেছে।
জয়দেবের মেলার সময় দেওয়ানী আদালত বন্ধ থাকত। নানা জেলা
থেকে বাবাজী মাতাজীরা আসত। দূরদূরান্তর থেকে আসত যাত্রীর দল।
আর শুনলাম খোটরে-বাবার গল্প। শ্মশানের বটগাছের কোটরে থাকত;
সেই থেকে নাম হয়ে গেছে খোটরে-বাবা। অন্য জেলার লোক; মন্বন্তরের
বছরে এ গাঁয়ে এসে প্রথম যখন আস্তানা গাড়ে, তখন তার ছোকরা বয়েস।
কোটরে থাকতে থাকতে ভোলা ডোম তাকে একটা তালপাতার কুঁড়ে তৈরি
করে দেয়। মেলার যাত্রীরা এসে তাকে খাবারদাবার পয়সা দিত। তার
কোনো জাতবিচার ছিল না। একবার হলো কী, খোটরে-বাবার জড়িবড়িতে
মোহন্তের অম্লশূল সেরে গেল। খুশী হয়ে মোহন্ত তাকে সোনার তাগা গড়িয়ে
দিলেন। আর সেইসঙ্গে শ্মশানে তৈরি হয়ে গেল খোটরে-বাবার আশ্রম।
এখন তার বিস্তর বিষয়সম্পত্তি। ফি বছর চব্বিশ প্রহর হরিনামসঙ্কীর্তন করে।
চাষীরা সেই উপলক্ষে ঢেলে টাকা দেয়। সেই টাকায় আজ তার বিঘে চল্লিশ
জমি। এখন সে ঘোর বাবু। সেবাদাসী আছে।
আখড়ায় আখড়ায় এখন পাল্লা চলেছে কে বেশি চেলা পাকড়াতে পারে।
রাত্তিরে মেলায় গিয়ে তা বিলক্ষণ টের পেলাম। বছর কয়েক হল
এক বাবাজী রীতিমতভাবে আসর জাঁকিয়ে বসেছেন। মাথার ওপর বাহারে

চাঁদোয়া। রঙীন তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে বাবাজী বসে। পরনে তাঁর দামী সিল্কের গেরুয়া। বেশ গোলগাল চেহারা। চতুর্দিকে টাঙানো তাঁর ফটো। বেশির ভাগ ফটোই তাঁর সমাধি অবস্থায় তোলা। সেইসঙ্গে বিলি হচ্ছে ছাপানো হ্যাণ্ডবিল। টেবিলের ওপর বিক্রির বই রয়েছে—বাবাজীর কথামৃত। লাউডস্পীকারে কীর্তন হচ্ছে। ওপাশে পর্দাঘেরা জায়গায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কড়াই। স্তূপাকারে কুটনো কোটা। উনুনগুলোও যেন রাবণের চিতা। মাঝবয়সী হালফ্যাশনের কিছু মহিলা ঘোরাঘুরি করছেন। বাবাজী মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে দেখেশুনে সর্বদিক বজায় রেখে আসছেন। চারিদিক আলোয় আলো হয়ে আছে।

এদিক ওদিক ছোটবড় আরও অনেক আখড়া। যার যেমন ট্যাকের জোর তার তেমন জৌলুশ। কোথাও গান হচ্ছে লাউডস্পীকারে, কোথাও খালি গলায়। কোথাও ডে-লাইট, কোথাও হারিকেন।

বাউল এসেছে হাজারের ওপর। নানা জেলার নানা জায়গায় তাদের আখড়া। কাজ বলতে শুধু ভগবানের নাম।

আমাদের সঙ্গে ছিলেন ফ্রয়েড-পড়া হেল্‌থ সেণ্টারের এক ডাক্তার। বিন্দুসাধনের সঙ্গে গাঁজার এবং আখড়ার সঙ্গে ভক্তদের সম্পর্ক নিয়ে তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করছিলেন। হঠাৎ দেখলাম বোষ্টমবোষ্টমিদের দঙ্গলের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে আমার এক পরিচিত ছোকরা। 'কখন এলে—' শুনে সে কেমন যেন থতমত খেয়ে তাকাল। অন্যমনস্ক থাকায় আমাকে চিনতে তার এক মুহূর্ত লাগল। তারপর একটু রহস্যের মতো করে আমাকে একপাশে 'শুনুন' বলে ডেকে নিয়ে গেল।

বলল: বেশ কয়েক বছর আগের কথা। আমার এক কাকা নতুন বিয়ে করেছিল। কাকিমা লেখাপড়াও একটু আধটু জানতেন। সেই সময় গ্রামে এক সাধু এসে গাছতলায় আস্তানা গেড়েছিল। একদিন দেখা গেল গাছতলা খালি। সাধু চলে গেছে। এদিকে কাকিমাকেও পাওয়া গেল না। সেই থেকে কাকিমা নিরুদ্দেশ। আজ এই একটু আগে হঠাৎ কাকিমাকে দেখলাম। গলায় কণ্ঠি, কপালে রসকলি। আমি এগিয়ে যেতেই ভিড়ের মধ্যে কোথায় যে মিশে গেলেন কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না।

কথাটা শেষ করেই কাউকে বোধহয় দেখে হন্তদন্ত হয়ে সে এগিয়ে গেল। ফ্রয়েড-পড়া ডাক্তার ভদ্রলোকের কাছে ব্যাপারটা বেমালুম চেপে গেলাম।

পেছন থেকে কে একজন হঠাৎ আমার কনুইটা ধরে ফেলল। মুখ ঘুরিয়ে দেখি একজন চেনা লোক। নিচু গলায় বলল, গান শুনবেন? সেরা বাউলদের গান?

এক কথায় রাজী হয়ে আমরা তার পেছন পেছন চললাম। রাস্তাটা একটু অন্ধকার-অন্ধকার। খানিকটা এগিয়ে একটা পাঁচিল। পাঁচিলের মাঝখান দিয়ে দরজা। ভেতরে ঢুকে মনে হল কোনো আশ্রম। উঠোনের একপাশে একটা শানবাঁধানো বেদি। টিম টিম করছে একটা ছুটো হারিকেন। মধ্যিখানে আগুন। চারদিকে কিছু লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে। একতারা বাজছিল। উঠোনে জুতো খুলে রেখে আগুনের কাছে উঠে বসলাম। বেশ শীত। রাতও হয়েছে মন্দ নয়।

আগুনটাকে প্রায় কোলের মধ্যে নিয়ে বোম হয়ে বসে ছিল এক বুড়ো থুথ্‌রে বাউল। হাতে তার ন্যাকড়া জড়ানো একটা কল্কে। কাঁপা কাঁপা হাতে চিমটে দিয়ে কল্কেতে আগুন চড়িয়ে সামনেই একজনের হাতে দিল। একতারাটা নিয়ে এতক্ষণ সে শুধু টুং-টাং করছিল। সুর আসছিল না।

পেছন থেকে কে একজন খুরিতে করে চা এগিয়ে দিল। শীতের মুখে গরম চা বেশ জমল। খুরিটা নামিয়ে রাখতেই কানে এল এবার গবগবিয়ে একতারা বাজছে। বাউল এবার উঠে দাঁড়িয়েছে। গানও শুরু হয়ে গেল: ‘ওগো নাগরি, জাত গেল পেট ভরল না গো গাগরী।…গোসাঁই কবির চাঁদে কয়: মোদের নাইক লাজ ভয়, সবাই মিলে বল মোদের গৌরহরির জয়।’

আসর দেখতে দেখতে জমে উঠল। টিমটিমে আলোয় ভাল করে কারো মুখ দেখা যাচ্ছে না। ছায়াগুলো মাঝে মাঝে নড়ে নড়ে উঠে কেমন একটা রহস্যের জাল বুনে চলেছে। গান একজন শেষ করে তো আরেকজন ধরে: ‘মানুষে কী আছে, মানুষ আসতেছে আর যাইতেছে। মানুষে কী আছে। আমার আমায় রেখে আসছে মানুষ, ভবের হাটে মানুষ বসে তার কাছে। মানুষে কী আছে। হৃদয় মাঝে কল আছে। নীচে কলের মো[illegible] আছে, চারদিকে চার ডাল আছে—মানুষ পাতায় নড়তেছে।…মানুষে কী আছে!’

উঠে আসব আসব করছি। দরজা ঠেলে কে একজন ঢুকতেই আসরটা কলবলিয়ে উঠল। তার হাতেও একতারা। মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না। পৈঠের ওপর ঝুলি রেখে বসতেই কল্কেটা এগিয়ে গেল। তারপর ক[illegible]

কয়েকটা টান। ঠিকরানো আলোয় লোকটার মুখের ওপর দিকটা বারকয়েক ঝিলিক দিয়ে উঠল। কোথায় যেন দেখেছি-দেখেছি মনে হলো।

একতারায় একটা চেনা সুর বেজে উঠল। তারপরই শুরু হল গান:

হরি তোমায় ডাকিবার
আমার সময় হল কই…

গলাটা খুবই চেনা। সঙ্গে সঙ্গে গয়া প্যাসেঞ্জারের কথা মনে পড়ে গেল। সেই বিনা টিকিটের যাত্রী বাউল—পাশের কামরার ভদ্রলোকদের যে শাপমুক্তি দিয়েছিল।

আধো-আলো আধো-অন্ধকারে লোকটা সুরের এমন এক মায়াজাল বিছিয়ে দিল যে, কিছুতেই উঠে আসতে পারলাম না।

বাইরে বেরিয়ে বাউলদের ভিড় ঠেলে আসতে আসতে একজন বলল, ‘ঐ দেখুন, এক বোষ্টম বোধহয় এক বোষ্টুমীকে ভাংচি দিচ্ছে।’ মেলায় নাকি আকছার হয়।

পরদিন ভোরে উঠে বন্ধু ফিরল কলকাতায়। আমি চললাম মল্লারপুর। সেখান থেকে হাঁটাপথে যাব নিমপাহাড়ি।

মল্লারপুরের এক বাড়িতে স্নানখাওয়া সেরে, বেলাবেলি রওনা হওয়া গেল। শুনেছিলাম ঝুমুরের দল আছে এখানে। খোঁজ নিলে মন্দ হতো না। কিন্তু কথাটা তুলতেই গাঁয়ের লোকেরা এমনভাবে মুখ বিষ করে তাকাল যে ও নিয়ে আর এগোবার সাহস হলো না। স্পষ্টই বুঝলাম গাঁয়ের লোকে ওদের পাড়ায় যাওয়াকে ভাল চোখে দেখে না। ওদের সব নোংরা ব্যাপার-স্যাপার।

রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে যেদিকেই তাকাই সেইদিকেই দেখি দীঘি। আর সব দীঘিই তালদীঘি। এই একটা গাঁয়েই নাকি শ-দুই দীঘি! চোখে যা দেখলাম শুনে খুব অবিশ্বাস হলো না। গরুর গাড়ির চাকা-বসা লম্বা রাস্তা। অনেক দূরে আকাশের গায়ে মেঘ-মেঘ পাহাড়। রাজমহল।

ক্রোশখানেক যাওয়ার পর গাড়ির রাস্তা ডানদিকে বাঁক নিল। বাঁদিকে ঘাগার বন। বনের প্পায়ে-চলা রাস্তা ধরে আমরা চলতে লাগলাম। কথায় বলে, নদীর কূল আর শালের মূল—যেমন গরম তেমনি ঠাণ্ডা। লাল কাঁকর-মেশানো অদ্ভুত মাটি। জায়গায় জায়গায় উঁচু হয়ে আছে ঝামা-পাথর।

পায়ের দিকে না থাকিয়ে চললে হোঁচট খাওয়ার ভয়। বনের ভেতর এঁকে বেঁকে গেছে রাস্তা।

যেতে যেতে গাছ দেখি আর নাম জিজ্ঞেস করি। পাতা দেখেই বুঝতে পারি কোন্‌টা শাল, কোন্‌টা সেগুন। মহুয়াও পারি। আম জাম কাঁঠালের তো কথাই নেই। কিন্তু পিয়াল গাছ আগে দেখেছি বলে মনে পড়ল না। জেওলা আর চাকল্‌তাও নয়। ধোয়া আর মুরগা তো নয়ই। মুরগা গাছের ভালো কাঠ হয়। আর আছে গাব, করমচা, বৈচি, বনফুল, বকুল, অনন্তমূল, শতমূলী, হরিতকী, আমলকি, বহেড়া। ঘাগার বনে পাওয়া যায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থাম আলু—একেকটার আধমণ, তিরিশ সের ওজন।

খরগোশ আর বেজি ছাড়া কোনো জন্তু চোখে পড়ল না। শুনলাম বনে সাপ তো আছেই, বাঘ আর শুয়োরও আছে। খরগোশকে এখানকার লোকে বলে 'শশা'; নখীর চেয়ে খুরীর মাংসে স্বাদ বেশি।

পাখির মধ্যে এ বনে পাওয়া যায় ময়না, টিয়া, ট্যাশকোনা, শালিখ, কোকিল, কাকাতুয়া, চোখ-গেল, বউ-কথা-কও। শিকারের পাখির মধ্যে তিতির, গেরুল, ডাবুক, ঘুঘু। গেরুল পাখিকে মুরগাভিও বলে।

হাঁটতে হাঁটতে বেশ মালুম হচ্ছিল ক্রমশ উঁচুর দিকে উঠছি। খানিকটা খানিকটা ফাঁকা জায়গা, আবার হয় গাছের জটলা নয় কাঁটা বন। কাঁটা একবার কাপড়ে বিঁধলে ছাড়ানো মুস্কিল।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি সামনে এঁকে বেঁকে গেছে একটা খাল। খাল পেরোবার সাঁকোয় পৌছুতে আরও বেশ খানিকটা হাঁটতে হলো। পশ্চিমে সূর্যের বেশ চোখ-ঢুলুঢুলু অবস্থা।

খাড়া রাস্তায় বেশ খানিকটা উঠতে হলো। উঠেই নিমপাহাড়ি। সামনে কয়েকটা টোপাকুলের গাছ। তার আড়ালে টুকু'দার বাড়ি। তেষ্টাও পেয়েছিল খুব। কিন্তু সব উৎসাহ জল হয়ে গেল যখন শুনলুম টুকু'দা বউ নিয়ে শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ে গেছে পরব করতে। বউ থাকবে। টুকু'দা রাত্তিরে ফিরবে খাওয়াদাওয়া সেরে।

নিমপাহাড়ির টুকরো টুকরো খবর পরে টুকু'দার কাছ থেকে পেলাম। টুকু'দারা অনেক পুরুষ ধরে এখানে। এ গাঁয়ে আগে দুশো আড়াইশো ঘর লোকের বাস ছিল। টুকু'দার ছেলেবেলাতেই তো এ গাঁয়ে একশো ঘর লোক ছিল। এখন পঁচিশ ঘর লোকে এসে ঠেকেছে। এ গাঁয়ে হাঁসদা,

টুডু আর বেস্‌রাদের বাস। মুরমু, মারডি, কিস্‌কু, হেমব্রম, সোরেন, চঁড়েরা থাকে অন্য অন্য গাঁয়ে। টুকু'দার বিয়ে হয়েছিল দশ বছর বয়সে; টুকু'দার বউ গীছার বয়স তখন পাঁচ কি ছয়। টুকু'দার শ্বশুরদের পারিশ হলো মারডি।

টুকু'দার কর্তাবাবা শাল্‌কুর ছিল তিন কুড়ি বিঘে জমি। তার সাত বেটা, দুই মেয়ে। খরার বছরে পাঁচ মণ ধান কর্জ করেছিল বলে আট দশ বিঘে জমি মহাজনের পেটে চলে যায়। এ গাঁ ছেড়ে যারা আসামের চা-বাগানে কিংবা বর্ধমানে পালিয়ে গেছে, তারা সবাই গেছে অজন্মায় জমিহারা হয়ে। টুকু'দারা পাঁচ ভাই: রেঙা, মোড়ল, টুকু', রাকদা, লুস্থ। সেজো আর ছোটই শুধু এখন বেঁচে। পাঁচ ভাইয়ের ছিল পাঁচ বিঘে পৈতৃক জমি। এখানে জমি বলতে সবই প্রায় ডাঙা জমি। বৃষ্টি হলে তবে ফসল হয়। ভাল বৃষ্টি হলে বিঘেতে পাঁচ ছ মণ হবে। জষ্টি মাসে বুনলে ভাদ্দরে ওঠে কহু ঘাস। বিঘেয় এক মণ। এক মণ কহুতে চাল হয় তিরিশ সের।

পাশেই কলাইপাহাড়ি জঙ্গল। জঙ্গলটা আগে ছিল মোহন্ত ভগবানদাসের। জমিদারি উচ্ছেদের পর এখন সরকারি বন। এই বনের কিছু কিছু জমিতে সাঁওতালরা আগে মকাই চাষ করত। জমিদার তার ভাগ নিত। বন সরকারি হওয়ার পর থেকে সাঁওতালদের চাষ বন্ধ।

বরবটি-কলাই এ জমিতে ভাল হয়। ভাল করে সার দিলে বিঘেতে চার-পাঁচ মণও হতে পারে। সয়াবিনের চাষও হতে পারে। এ জমিতে আর ভালো হয় কাঁঠাল গাছ। আশেপাশে পতিত জমিও কিছু আছে যেখানে চাষ হতে পারে। কিন্তু সেচের সমস্যাই আসল।

এদিকে ক্যানেলটা যেভাবে কাটা হয়েছে, তাতে ডাঙা জমির জল ডামড়ার মাঠে যেতে পারছে না। ক্যানেলের বাঁধে সে জল আটকে যাচ্ছে। আগে বনের পাতা-ধোয়া জল জমিতে সারের কাজ করত। এখন ডামড়ার মাঠে ক্যানেলের জল না নিলে চলে না। সে জলে আগেকার মতো ফসল হচ্ছে না। আবার ক্যানেলের জলও ফি বছর পাওয়া যায় না।

এ অঞ্চলে কাঁদরের জল আসে পাহাড়ের ঝর্ণা থেকে। দু দোণ, তিন দোণ জল। বারো মাসই কিছু না কিছু থাকে। বাঁধ দিয়ে জল জমিয়ে রাখলে এ অঞ্চলের চেহারা বদলে যায়। চার-পাঁচটা বাঁধ হলেই হয়। নিজেরা চাঁদা তুলে করবে সে উপায় নেই। খাজনাই দিয়ে উঠতে পারে না, চাঁদা দেবে কোত্থেকে? তবে তারা গতরে খেটে দিতে রাজী।

টুকু দারা বাড়িতে কেউ নেই দেখে, দূর থেকে মাদলের শব্দ শুনে ঝোলাঝুলি রেখে আমরা গেলাম নামালের দিকে গ্রাম দেখতে।

সূর্য ডুবে গেলেও বাইরে তখনও আলো। দূরে ধোঁয়া-ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে একটানা রাজমহল পাহাড়। জায়গায় জায়গায় তার এককেকটা করে নাম। কোথাও বলে শালবনী, কোথাও মনসা, কোথাও বেনাগুড়িয়া, কোথাও বাঁশপাহাড়ি, কোথাও কাঠপাহাড়ি, কোথাও বলে কাঁড়াকাটা।

সব চেয়ে উঁচুতে নিমপাহাড়ি গ্রাম। তার আশপাশে ছড়ানো রায়পুর, পলাশবনী, ধরমপুর, হচুকপাড়া, উলপাহাড়ি, বড়জোল, গড়িয়া, আগুইয়া, হামিরপুর, ডামড়া। রায়পুরে বেশির ভাগ জোলার বাস; ডামড়ায় তেলী আর ঘোষ—আর আছে বাউড়ি, লেট, বাগ্দী, শুঁড়ী, ব্রাহ্মণ, বেণে, নাপিত।

ধরমপুর যেতে বেশ খানিকটা নামতে হয়। রাস্তার দুপাশে মজার মজার পাথর। দেখে মনে হবে কাঠের টুকরো, হাতে নিলে দেখা যাবে পাথর হয়ে গেছে।

উপরপাড়া আর নামালপাড়া মিলিয়ে ধরমপুরে একশো ঘর লোক। পুরোপুরি সাঁওতালদেরই গ্রাম। উপরপাড়া গরীব—কিষাণ, মাহিন্দার আর ভাগচাষীরা থাকে; এদের বলে রাঙাই হড়। আর নামালপাড়ায় থাকে কিষণ হড়—তাদের ঘর-গিরস্থি আছে।

মাদলের আওয়াজ হচ্ছিল নামালপাড়ায়। আমরা সেইদিকেই ছুটলাম। কাল এ গাঁয়ের বন-ঝাড়ার দিন। সবাই তাই নেচে গেয়ে তৈরি হচ্ছে। বাঁধনা পরবের শেষ হয় বন-ঝাড়া দিয়ে। গাঁ-স্বন্ধ লোক জঙ্গলে শিকারে যায়—তারই নাম বন-ঝাড়া।

বনে সারা দিন ঢুঁড়েও একটা দুটো খরগোশের বেশি কিছু মিলবে না। গোটা গাঁয়ের তাতে কী হবে? এককে দিন এককে গাঁয়ের বন ঝাড়বার পালা। তাও আগেকার সেই জঙ্গল আর সে জঙ্গলে আগের মতো শিকার থাকলে কথা ছিল। সারাদিন বন ঠেঙিয়ে সন্ধ্যেবেলা যার যার বাড়ির শুয়োর মুর্গী মেরে পরবের ভোজের ব্যবস্থা হবে। কিন্তু শিকার না মিলুক, বন-ঝাড়ার দিন আরও নানা মজা হয়—জোড়ায় জোড়ায় শিকার যতটা নয়, শিকারের ভান করে তার চেয়ে বেশি মজা।

চাল কুটতে কুটতে এ সব কথা বলছিল গাঁয়ের এক বুড়ি। বুড়িকে বললাম, গান শোনাও। প্রথমে গাঁইগুঁই করল, তারপর কাঁসার বাটিতে গরম

চা এগিয়ে দিয়ে একটার পর একটা গান শোনাল। সোজা বাংলায় গানগুলো এই:

অনেক কুটুম এসেছে
ছোট ছোট মুর্গী আর শুয়োর
আমি ভাগ করতে পারব না, বাবা—
তুমিই কুলিয়ে দাও, বাবা।

—

এতদিন বাঁধ্না কোথায় ছিলি?
পৃথিবীতেই ছিলাম;
পৌষ মাসের
কুড়ি দিন পুরতেই
আমি আস্তে আস্তে চলে এলাম।

—

যেমন যেমন
পৌষ মাস ফুরোচ্ছে
আমিও তেমনি
এগিয়ে এগিয়ে আসছি।

—

আজ তো স্নান হলো
দলমাদল (বাঁধা) পুকুরে;
ঘরে কাল শুয়োর-মুর্গীর পুজো হবে।

—

ঘর তো বড় বটে,
লোক মেলাই।
জলকল্সি তো নেই,
লোক মেলাই।
কল্সী কী হবে?
ঘরে তো আছে পাঁচ ঘড়া
ঘড়া দিয়ে পুকুর থেকে জল আনো।

নামালপাড়া থেকে যখন উঠলাম, সঙ্গের হারিকেনটা জ্বালতে হলো।

পা ঠ ক গো ষ্ঠী

আধুনিক বাংলা কবিতা প্রসঙ্গে

গত শারদীয় 'পরিচয়'-এ যে কয়টি অনবদ্য মননশীল রচনা পরিবেশিত হয়েছে, তার মধ্যে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শূন্য প্রেক্ষাগৃহ ও করুণ কুশীলব' নিঃসন্দেহে অন্যতম। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিতার জন্মকাল থেকে সাম্প্রতিক কালের তরুণ কবিদের কাব্য-প্রয়াস পর্যন্ত যে আলোচনা তিনি তাঁর স্বল্প পরিসর প্রবন্ধে করেছেন, তা একদিকে যেমন প্রশংসার্হ, অন্যদিকে তেমনি মনোমুগ্ধকর! কবিতার ব্যাপারে পাঠক-সমাজের ঔদাসীন্য যখন উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে, আর সীমাহীন এই নিস্পৃহতার কারণের মধ্যে 'আধুনিক বাংলা কবিতা দুর্বোধ্য'—এমন একটা অভিযোগও যখন কোনো কোনো মহলে এখনো পর্যন্ত প্রচলিত, তখন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কবিতার আলোচনা কাব্য-প্রেমিক মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য। এতে সাধারণ পাঠকদের অহেতুক কাব্য-ভীতি ক্রমশ প্রশমিত হবার সম্ভাবনা। সুতরাং দিশেহারা পাঠক সমাজ সরোজবাবুর আলোচনার জন্যে এদিক থেকেও তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

আধুনিক বাংলা কবিতা সমৃদ্ধির দিক থেকে বিস্ময়কর; বৈচিত্র্যে ঐশ্বর্যবান। আয়তনে ছোট হলেও সরোজবাবুর আলোচনার সময়-সীমা তিরিশ বছরের বেশি পর্যন্ত বিস্তৃত। সুতরাং তাঁর কোনো কোনো সিদ্ধান্তের জন্যে কখনো কখনো তাঁর সঙ্গে মতানৈক্য হওয়া অনিবার্য কারণে স্বাভাবিক। যেমন অমিয় চক্রবর্তী সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তে তাঁর সঙ্গে যে কেউ কেউ একমত হতে পারবে না এক নিশ্চিত; এবং কারো কারো কাছে মনে হবে তাঁর এই উক্তি অংশত সত্য। অবশ্য, একথা অস্বীকার করা যায় না যে, অমিয় চক্রবর্তী "জীবনের আটপৌরে মুহূর্তের চিত্রায়ন" করতে ভালোবাসেন এবং "সহজের মাধুর্যকে" প্রকাশ করার প্রবণতাই তাঁর বিশিষ্ট কবি-স্বভাব। রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের কবিতার সঙ্গে তাঁর বহু কবিতার আত্মিক মিলও দৃষ্টি এড়ায় না কারো। এদিক থেকে অমিয় চক্রবর্তী নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের সার্থক উত্তরসূরী। তবু না মেনে উপায় নেই যে, তিনি রবীন্দ্রনাথের পুনরাবৃত্তি নন কিছুতেই; বরং ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেও,

স্বকীয়তায় তিনি তর্কাতীতভাবে ভাস্বর। রবীন্দ্রনাথের মিষ্টিক চেতনা থেকে তাঁর চেতনা মূলগতভাবে পৃথক। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি অতীন্দ্রিয়; মাটি থেকে জন্মলাভ করেও, তাঁর কবিতা মুহূর্তে আকাশচারী হয়ে যায়। অথচ অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় ওই অতীন্দ্রিয় ভাবনা প্রায়ই অনুপস্থিত। তাঁর কবিতায় আমরা যা পাই, তা আমাদের চারপাশে ছড়ানো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগৎ। প্রত্যক্ষ পৃথিবীর বাস্তব জীবনযাত্রার ইতিবৃত্তকে তিনি অপরূপ ব্যঞ্জনায় ব্যঞ্জিত করে তুলেছেন তাঁর কবিতায়। দেশ-কালের সীমানা ধ্বসে পড়ে তাঁর চোখের সামনে। শান্তিনিকেতনের স্মৃতি, ট্রেনে যেতে চোখে-পড়া ধানের মরাই, কলাগাছ, ঘাসে-ছাওয়া খিড়কি-পথ, গ্রেনাডিন দ্বীপের সমুদ্র-তীরের নারকেল-বীথির নিঃসঙ্গ হাতছানি, মার্কিনী জীবনযাত্রা, যুদ্ধ-বিতাড়িত ডানজিগের মেয়ে, ইহুদি পরিবার, স্পানিশ উদ্বাস্তু, যান্ত্রিক সভ্যতার অভিশাপে ক্লিষ্ট নরনারী, বোমা-বিধ্বস্ত জার্মানির বেদনা—এক কথায় সমস্ত পৃথিবীর মানুষ এসে ভিড় করে তাঁর কবিতায়। আর, আমার মনে হয়,—এখানেই অমিয় চক্রবর্তীর আধুনিকতা।

"জীবনের সহজের মাধুর্যকে তিনিও সর্বস্ব বলে ভেবেছেন" বলে যে মন্তব্য সরোজবাবু করেছেন, তা যে অন্তত অংশত অমূলক, তারও প্রমাণ রয়েছে "একমুঠো"র 'যুদ্ধের খবর,' "মাটির দেয়াল"-এর 'বড়োবাবুর কাছে নিবেদন', "পারাপার"-এর 'অন্নদাও', 'সনেট', 'সন্দীপ' প্রভৃতি একাধিক কবিতায়। "দূরযানী" এবং "অভিজ্ঞান বসন্তের"-এর কতিপয় কবিতার কথাও এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। সামাজিক অসঙ্গতি, আধুনিক সভ্যতার নির্মমতা, তেরোশ' পঞ্চাশের মন্বন্তরের অন্তরালে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের মর্মন্তুদ কাহিনীর চিত্রায়নও যে তাঁর রচনায় অনুপস্থিত নয়, উল্লিখিত কবিতাগুলিই তার প্রমাণ।

"প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং অজিত দত্তের কাছে, অন্নদাশঙ্কর এবং অমিয় চক্রবর্তীর হাতে আধুনিক কবিতার ঋণ অনেক হলেও, কালের জটিল লিপির পাঠোদ্ধারে এঁদের আগ্রহ ছিল অনুগ্র"—সরোজবাবুর এই উক্তি পীড়াদায়ক। উল্লিখিত চারজন কবির মধ্যে তিনজন সম্বন্ধে আপাতত নীরব থাকাই সমীচীন। কিন্তু অমিয় চক্রবর্তীর কবিতাবলী পড়লে, সরোজবাবুর উক্ত সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে; কারণ তাঁর কবিতায় বর্তমান কাল ও সমকালীন জীবন নির্ভুলভাবে প্রতিবিম্বিত।

জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথ-বুদ্ধদেব ও বিষ্ণু দে প্রমুখ কবিদের লক্ষ্য করে

সরোজবাবু' বলেছেন, "এঁরাই উপলব্ধি করেছিলেন যে, বাংলা কবিতার ঐতিহ্যগত গীতলতার পিছুটান না ছিন্ন করলে তিরিশের ভাবনাকে কাব্য-শরীর দান করা যাবে না।" সরোজবাবুর এই মন্তব্য যথার্থ। এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমিও একমত। বাংলার ঐতিহ্যগত তরল গীতলতার সঙ্গে তিরিশের আধুনিক কবিরা এও প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের স্বরের ইন্দ্রজালে মোহাচ্ছন্ন কবিরা তাঁর "সেই মোহিনী মায়ার প্রকৃতি না-বুঝে শুধু বাঁশি শুনে ঘর ছাড়লেন।...এই ভুলের জন্য—ভুল বোঝার জন্য—তাঁদের লেখায় দেখা দিলো সেই ফেনিলতা, সেই অসহায়, অসংবৃত উচ্ছ্বাস, যা 'স্বভাবকবি'র কুল লক্ষণ ;—শৈথিল্যকে স্বতঃস্ফূর্তি বলে আর তন্দ্রালুতাকে তন্ময়তা বলে ভুল করলেন তাঁরা।"[১] পূর্ববর্তীদের এই ভুল থেকে শিক্ষা নিলেন তিরিশের কবিরা ; আর সেই সময় থেকে কবিতায় ভাবালুতা পরিহার করার সাধনায় তৎপর হলেন তাঁরা। অমিয় চক্রবর্তীও এই সাধনার প্রতি বিমুখ ছিলেন না কখনো এবং তাঁর সিদ্ধিও এদিক থেকে, আমার বিশ্বাস, তর্কাতীত। "বিষয়-ভাবনার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে" তাঁর কবিতা "কিছুটা সময় গাণিতিক ঋজুতার হাত ধরে দাঁড়িয়ে থেকেও, হাত ছাড়িয়ে ছুটে যেতে চায় সঙ্গীতের দিকে"—সরোজবাবুর এই উক্তির তাৎপর্য যদি এই হয় যে, অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা ভাবালুতা থেকে মুক্ত হতে পারে নি, তাহলে সরোজবাবুর সঙ্গে একমত হওয়া দুঃসাধ্য।' মূলত হৃদয়াবেগ থেকে যে-সব কবিতার জন্ম হয়েছে, অমিয় চক্রবর্তীর সেই কবিতাগুলিও চোখ-ছলছল করানো অসংবৃত উচ্ছ্বাসে বাষ্পাচ্ছন্ন নয়। আর "ভাবালুতা" থেকে কবিতাকে মুক্ত করে এবং কবিতার নতুন প্রকরণ আবিষ্কার করার পরেও, সঙ্গীতের দিকে প্রবণতা ছিল তিরিশের কালের অধিকাংশ কবির মানস-ধর্ম। এবং জটিল আধুনিকতার দর্পণ রচনাতেও তাঁরা কখনো অসফল হন নি। বিষ্ণু দে, যিনি সাহিত্যের আধুনিক পর্যায়ে সবচেয়ে কীর্তিমান বলে সরোজবাবু বলেছেন, তাঁর বৈশিষ্ট্যও যে সঙ্গীত-ধর্ম এবং বিশুদ্ধ আবেগই যে তাঁর কবিতার প্রাণশক্তি—সরোজবাবু নিশ্চয় তা স্বীকার করবেন। বিষ্ণু দের বিখ্যাত এবং বহুপঠিত 'ঘোড়সওয়ার', 'ক্রেসিডা', 'ওফেলিয়া', 'মহাশ্বেতা' এবং আরো অনেক কবিতার স্বরের আশ্চর্য সম্মোহনে পাঠক-মন আলোড়িত হয়ে ওঠে ; আর পড়বার পরও কবিতাগুলির সঙ্গীতের অনুরণন থেমে যায় না সহজে। বিষ্ণু দে সঙ্গীতের মধ্যে, ছন্দের বিচিত্র অর্কেষ্ট্রায় যে

(১) বুদ্ধদেব বসু (সাহিত্য-চর্চা, পৃষ্ঠা ১১০-১১১)

সহজ হন, সাচ্ছন্দ্য বোধ করেন এবং কবিকুশলতার সিদ্ধিতেও যে দুর্জয় বলে প্রতীতি জন্মান আমাদের—আমার ধারণা—তা তাঁর কবিতায় সঙ্গীত-ধর্মের প্রাধান্যের জন্যই। সঙ্গীত আর আবেগের ওপর তাঁর অনুরক্তি যেখানে শিথিল, যেখানে বিশুদ্ধ চিন্তাবস্তুকে অন্য কোনো প্রযুক্তির সাহায্যে গাণিতিক ঋজুতায় প্রকাশ করার প্রয়াস প্রকট, সেখানে তাঁর অনন্যতাও ঈষৎ ক্ষুণ্ণ।

"শীতল মুহূর্তের প্রতি আনুগত্যের ফলে শেষ পর্যন্ত কাব্যের নতুন প্রকরণ রচনায়" অমিয় চক্রবর্তী "আর আগ্রহী হন নি"—সরোজবাবুর এ-রকম উপসংহারেও সায় দেওয়া রীতিমতো দুঃসম্ভব। অবশ্য সরোজবাবু এই কথাও বলেছেন যে, "তিনি (অমিয় চক্রবর্তী) চেয়েছিলেন গাণিতিকতা এবং ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্যের শুভ মিলনে নিজস্ব বাণী বিন্যাস। সংক্ষিপ্তি আর দ্রুততায় তাঁর বাক্‌ভঙ্গি অবস্মরণীয়।" সরোজবাবুর উপর্যুক্ত উক্তি দুটি পরস্পর বিরোধী। "কাব্যের নতুন প্রকরণ রচনায়" "যিনি আগ্রহী হন নি", তাঁর পক্ষে "অবিস্মরণীয় বাক্‌ভঙ্গি" অর্জন করা কি করে সম্ভব হলো—ভেবে অবাক হতে হয়।

উত্তর-তিরিশের অধিকাংশ তরুণ কবিদের ওপর জীবনানন্দের প্রভাব যেমন অপ্রতিরোধ্য এবং বিপুল, তেমন কোনো সর্বগ্রাসী প্রভাব সাম্প্রতিক কালের কবিদের ওপর অমিয় চক্রবর্তী হয়তো সঞ্চারিত করতে পারেন নি ; তবু তরুণতর কবিদের মধ্যেও যে কেউ কেউ তাঁর প্রভাব এড়াতে পারেন নি, অন্তত তাঁর রচনার রূপভঙ্গি যে আকৃষ্ট করেছে তাঁদেরও—নিচের উদ্ধৃত কবিতাটি থেকে স্পষ্ট তা প্রতীয়মান হয়। সংক্ষিপ্তি আর দ্রুততা ; যা তাঁর প্রকরণের অন্য এক চরিত্র-লক্ষণ, উদ্ধৃত কবিতাটির অবয়বে সেই প্রকরণ-কৌশলই নির্ভুলভাবে উপস্থিত।

"যাওয়ার যা তা যাবেই
তবু
যাওয়ার ঘণ্টা বাজে যখন
মনটা ফাঁকা :
'এবার গেলে ফিরবে সে-মন।'
দুঃখ শোকের ছায়াছবি সারা স্টেশন।

নীল আলোয় সংকেতিত
ট্রেনের চাকা

রুমাল ওড়ে
ভাঙা বুকের হাওয়া ধোঁয়ায়
বাষ্পে ঢাকা ॥"

(পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য)

সাম্প্রতিক কালের অন্য একজন বিশিষ্ট কবি—সিদ্ধেশ্বর সেন। ইনি আয়ত্ত করেছেন, যতিহীন ভাঙা ভাঙা পংক্তির নিজস্ব এক প্রকাশভঙ্গি। আত্মীয় না হলেও, তাঁর কবিতার বহিরঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর উপস্থিতি লক্ষণীয়—এ রকম কথা বলতে কখনো কখনো আমি লুব্ধ হই। অন্তত, ভাঙা ভাঙা পংক্তির কবিতা অমিয় চক্রবর্তীতে দুর্লভ নয়। যেমন :

"নদী, শাখানদী, পুকুর, কচুবন, কলাবাগান, মাদার
দোপাটি, ছোলাক্ষেত, শর্ষে, দূরে মাটির দেয়াল
কুমড়ো-লতানো চাল
—বাংলা—"

সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতার আমি একজন অনুরাগী পাঠক। অমিয় চক্রবর্তীর প্রভাব আবিষ্কার করে তাঁর কবিতার কলঙ্ক রটনা করা উদ্দেশ্য নয় আমার। কারণ আমি জানি যে, অমিয় চক্রবর্তীতে যা ছিল আভাস, সিদ্ধেশ্বর সেন-এ তা পরিণত রূপ। সুতরাং আমার যা বক্তব্য—তা শুধু এই যে, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার কাব্য-শরীর নির্মাণেও অমিয় চক্রবর্তীর দান যে অপরিসীম তা না মেনে উপায় নেই কিছুতেই।

বিকাশ দাশ

পুস্তক সমালোচনা

পরিচয়ের পুস্তক সমালোচনা করতে গিয়ে আমার নিজের মনে কতকগুলি ধারণা জন্মেছে। সেই ধারণা থেকে যে মতবাদ আমাকে পীড়িত করছে, সেই পীড়িত বেদনার স্বরূপটিকে লিখে প্রকাশ করছি।

বাংলাদেশে জন্মাবার অধিকারেই অনেকে লেখক হয়ে থাকেন। তার জন্যে মুন্সীয়ানার কোনো প্রয়োজন হয় না। এমন অনেক ব্যক্তি আছেন বা তরুণ কবি আছেন, কবিতা কি তা জানেন না; কিন্তু স্কুল বয়স থেকে পদ্যপ্রবণতার প্রবল প্রত্যয় যৌবনে বা প্রৌঢ়ত্বে তাঁকে একদিন লেখক হিসাবে, কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। সাহিত্যের অন্যান্য শাখায়ও এর ব্যত্যয় হয়েছে বলে মনে

হয় না। বাংলা দেশে এই শ্রেণীর লোকই সাহিত্যাকাশে তারার আলো নিয়ে ছেয়ে আছে। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে অনুভূতির বাণীমূর্তির জন্যে যে-লোক অহরহ অন্তর্বেদনায় প্রকাশমান হচ্ছে, তার কৃতিকে আমরা তেমন স্থান দিই না, মৃত্যুর পর হয়তো দিই। কিন্তু তাতে কার কি আসে! এহেন লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে সমালোচনার তকমা আঁটেন অনেকেই। কেন না তাঁরা বোঝেন, সমালোচনা মানেই হলো, কিছু নিন্দা ও বক্ষ্যমান পুস্তকের কিছু উল্টো কথা। তাই লেখকের মতো সমালোচকও আজ আমাদের ঘরে ঘরে। ওপারের বাজারে এমন বাঁটোয়ারি লেখক আজ নেই, সে কথাও বলছি নে, বরং সংখ্যার হারে বাংলাদেশের মতনই। সুনীতিবাবুর ভাষাতত্ত্বের আলোচনার বইয়ের, সংবাদপত্রে বা সাময়িকপত্রে সমালোচনার ভার দেওয়া হলো এমন একজন ব্যক্তিকে যিনি হয়তো প্রুফ সংশোধন করে কবি হিসাবে কিছু খ্যাতি পেয়েছেন। বড়ো পত্রিকায় এমন হামেশাই ঘটে, সুনীতিবাবুর বইয়ের প্রকাশকেরা তাঁদের আপ্যায়নও করেন। কেননা, প্রকাশকেরা বাংলাদেশে সাহিত্যবোদ্ধার চরম মাপকাঠি, তাঁদের ওপরই লেখকের রুটিরুজি। এহেন সাহিত্যের বাজারে সৎলেখক বা পুস্তক সমালোচনা সম্বন্ধে নির্ভয়ে কিছু বলা কষ্টকর।

পুস্তক সমালোচনা করতে গিয়ে আমার ভালো লাগলো বা মন্দ লাগলো—এই কথাটাই চরম কথা নয়। ভালোলাগার আনন্দকে কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ নবীন সৃষ্টি করতে পারেন, কিন্তু সমালোচকের দায়িত্ব তা নয়। কোনো একটি বিশেষ মতবাদে আস্থা রেখে সমালোচনা করতে যাওয়াও বিশেষ মারাত্মক ভ্রান্তি। মানুষের জীবন ও জগৎ যেমন প্রত্যক্ষ ও পরিবর্তমান, লেখকের জগতও তেমনি। মানুষ ও জগৎ যেমন অনবরত পরিবর্তনের গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, সৎ লেখক তাকেই ধরতে চেষ্টা করেন। নিরন্তর পরিবর্তনের মধ্যে জগতের আত্মার উন্নতির আকাঙ্ক্ষা থাকে কিনা জানি নে, মানুষ হিসাবে লেখকের আকাঙ্ক্ষা থাকে, যার মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষা নেই সে মৃত। রুদ্ধ পরিবর্তনের মধ্যে স্তব্ধ। তাঁকেই আমার মতে প্রতিক্রিয়াশীল বলে মনে হয়। সমালোচকও এই রীতিতে বিশ্বাসী হবে। সমালোচককে লেখকের চেয়েও বড় দায়িত্ব পালন করতে হয়। সমালোচক চিত্র, ছবি আঁকতে পারেন না বটে, সংগীতের সুর তার কণ্ঠ থেকে বেরোয় না বটে, কিন্তু চিত্র, ছবি, সঙ্গীত, মানুষ, জগৎ, ন্যায়, অন্যায়, মূল্যবোধ, পরিবর্তন পরিণাম সম্বন্ধে ব্যাপক ও গভীর

ধারনার তপস্যা তাঁকে করতে হয়। লেখকের লেখায় অসংলগ্নতা ও ভুলকে ধরতে গেলে, সমস্ত জগৎসংসারের বিচারক সাজতে হয়। এই বিচারক উপরওয়ালার নির্দেশ মানেন না, বিবেকের সঙ্গে জাগতিক ন্যায়নীতি মঙ্গল কামনাই তাকে সর্বব্যাপ্ত বিশ্বআত্মার সঙ্গে এক করে দেয়। বিচারক যেমন সমবেদনার অনুভূতিতে সমস্ত ঘটনার অভ্যন্তরে নিজেকে একাত্ম করে আপন কার্যের ফলাফল নির্ণয় করেন, সমালোচকও সেই ভাবে প্রতিটি গল্পের ঘটনায়, কবিতার রসে, নাটকের দ্বন্দ্বে লেখকের বস্তুতাৎপর্য পরিণামের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে তার মর্মার্থ বোঝেন। লেখক কি বলতে চান, এই বলতে চাওয়ার সঙ্গে গল্পকাহিনী, চরিত্র, ভাষা, ছন্দ, রীতি কি ভাবে কেমন করে কেন ব্যবহৃত হয়েছে—এগুলি বিশেষ লেখকের বিশেষ সত্তা নিয়ে সমালোচকরূপী বিচারককে অনুভব, বিচার ও বিশ্লেষণ করতে হয়। গল্পের বিচার নাটকের বিচার নয়, নাটকের বিচার কবিতার বিচার নয়। কিন্তু সাহিত্যের মৌল উদ্দেশ্য ও রস, পরিণাম কিন্তু একই। এমন অনেক সমালোচনা দেখা গিয়েছে যাতে লেখককে গালাগাল করে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেছে, অথচ মূলত সমালোচকের বক্তব্যের সঙ্গে লেখকের বক্তব্য সমধর্মী, একাত্ম। যেমন 'পরিচয়'-এ আমার নিজের 'স্ফুলিঙ্গ' বইয়ের সমালোচনায় অজিত গঙ্গোপাধ্যায় যে কথা বলেছেন আমার নাটকের ভূমিকাতে সেই কথা অন্যভাবে মাত্র বলেছি। এখানে সমালোচকের অসতর্কতাই প্রমাণিত হচ্ছে। এই অসতর্কতা আরো প্রকট হয়ে ওঠে কবিতার আলোচনায়। দলভুক্ত কবিদের কিছু না পড়েই কয়েক পংক্তি তুলে সৎ কবি বলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হলো, এবং বর্তমানে প্রতিক্রিয়াশীল বা তরুণ কবির বিরুদ্ধপক্ষদের নিন্দাবাদ করা হলো। সমালোচনায় নিন্দাবাদের কোনো স্থান নেই। তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক সমালোচনাতেও নেই। আমি অস্বীকার করছি নে যে সমালোচকের নিজের ব্যক্তিত্বের ও রুচির চিহ্ন সমালোচনায় থাকে না। কিন্তু না থাকাই বাঞ্ছনীয়। কেন না উন্নত লেখকের আদর্শও অনেক সময় ভ্রান্তিকর। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্যে এমন অনেক লেখককে প্রশংসা করেছেন যাঁদের লেখা সাহিত্য নয় বলেই আজ আমরা পড়ি না। সমালোচক যদি কবি হন, কবিতার আলোচনায় তাঁর নিজের ছন্দ খুঁজতে থাকেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় আমার একটি সনেটে ছন্দদোষ ধরলেন, অথচ আমি জানি তাতে ছন্দদোষ নেই। এটি বিশেষ রুচির প্রশ্ন। সমালোচক শুধু বোঝেন না, বোঝান। তাই তাঁর ভাষা পরিচ্ছন্ন

যৌক্তিক বিশ্লেষণ মুখর হবে। সমালোচক যে বক্তব্য বা মন্তব্য করবেন, তার যথাবিহিত প্রমাণসাপেক্ষ উদাহরণ বক্ষ্যমান বই থেকে তুলতে হবে। সাবজেকটিভ আলোচনা সেই স্তরেই স্বীকার করা হবে, যে স্তরে লেখক ও লেখকের বইয়ের কাহিনীর একাত্ম অনুভূতিতে সহায়তা করে। পুস্তক সমালোচনার স্থান সংক্ষেপে আলোচনার হত্যা অসহ্য।

প্রবন্ধ বা গবেষণাগ্রন্থের সমালোচনার পথ নির্দেশ আমার সাধ্যাতীত; তাই নিরস্ত হলুম। তবে এক্ষেত্রে বাংলাদেশে পিপীলিকা গবেষণার কথা বাদ দেওয়া হয়েছে, তা বলাবাহুল্য।

বার্ণিক রায়

'অভিযান' ও সমাজবাদী বাস্তবতা

সত্যজিৎ রায়ের 'অভিযান' সম্পর্কে ধ্রুব গুপ্তের আলোচনাটি সর্বতোভাবে মেনে নিতে পারলাম না। বাংলাদেশের চিত্রসমালোচকরা যেখানে অবিদ্যাপ্রসূত অকারণ প্রশংসায় কখনো বা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন, কখনো বা চরম অবিনয়বশত ছবিটিকে 'বাণিজ্যিক ছবি' ব'লে উন্নাসিকতা প্রদর্শন করেছেন, সেখানে ধ্রুব গুপ্তের স্থিতধী আলোচনাটি নিঃসন্দেহে উল্লেখ্য। কিন্তু তাঁর সুচিন্তিত মন্তব্যগুলি পূর্ণত আমার কাছে গ্রাহ্য নয়।

প্রথমেই ধ্রুববাবু বলেছেন, "তাঁর ছবি থেকে মানবিক অস্তিত্ব সম্পর্কিত এমন কোনো অভিজ্ঞতা আমরা আশা করতে অভ্যস্ত হয়েছি যা আমাদের অনুভাবনাকে অনেকদিন পর্যন্ত অধিকার করে থাকবে এবং ফলশ্রুতিতে আমাদের বোধকে সমৃদ্ধ করবে। তাঁর অব্যবহিত পূর্ববর্তী সম্পূর্ণ নিজস্ব সৃষ্টি 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' আমাদের সেই অভিজ্ঞতার অংশভাক্‌ করেছিল—তারাশঙ্করের উপন্যাসাশ্রয়ী এই ঘটনাবহুল বিপুলকায় ছবিটি উপভোগ্য হলেও সে রকম কোনো অভিজ্ঞতায় মনকে সমৃদ্ধ করে না।"

অসুবিধেটা হয়েছে এইখানে। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'-য় কোনো একটা ধারাবাহিক চিত্রকাহিনী ছিল না, ছিল সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জটিল সম্পর্কের কয়েকটি আপাত অসম্পৃক্ত দৃশ্য, বুর্জোআ ও পেটি-বুর্জোআর সামাজিক স্ট্যাটাস-জনিত দ্বন্দ্ব, জরিষ্ণু বুর্জোআ সমাজের ভ্রান্ত সম্পর্ক (বিশেষত, বিবাহ-সম্পর্ক) ও ছদ্ম-ইউরোপীয়মন্যতা (হাঁচির শব্দে রায়বাহাদুরের থমকে দাঁড়িয়ে যাওয়া)—সব মিলিয়ে কতকগুলি বিমূর্ত ভাব বা আইডিআর সংঘাত, চিন্তার দরজায়

তার আবেদন অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও মর্মভেদী। কিন্তু 'অভিযানে' রয়েছে এক আশ্চর্য গতিময়তা, নিটোল একটি কাহিনী, এবং চোখ ও মনকে আকর্ষণ করার মতো আশ্চর্য অভিনয়, ক্যামেরার কাজ, দৃশ্যপট ও আরও অনেক কিছু। তদুপরি নরসিং-এর গাড়ির সঙ্গে প্রথম থেকে দর্শক ছোটার আনন্দটাই উপভোগ করে, 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'য় কিন্তু স্থির বিস্ময়ে সংলাপ অনুসরণ করা ছাড়া দর্শক অন্য কিছুতে ব্যাপৃত থাকতে পারত না।' 'অভিযান' "ঘটনাবহুল" বলেই ক্রিয়ার সংঘাত অর্থাৎ কন্‌ফ্লিক্ট অফ্‌ অ্যাকশান্‌টাই মনকে অধিকার করে থাকে, ভাবের সংঘাত অর্থাৎ কন্‌ফ্লিক্ট অফ্‌ আইডিআর অন্তঃশীলা ধারাটা চোখে পড়ে না। অথচ, এই ভাবের সংঘাতটা ভালোভাবে উপলব্ধি করলে আমরা মানবিক অস্তিত্ব সম্পর্কিত এ ন অনেক অভিজ্ঞতাই পেতে পারি যা আমাদের বোধকে সত্যিসত্যিই ফলশ্রুতিতে সমৃদ্ধ করবে।

ধ্রুববাবু ঠিকই বলেছেন, "অভিযানকারী চরিত্রটির···সমস্যা দ্বিবিধ—সামাজিক স্তরভেদের নিম্নপর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায়ে উত্তরণের প্রচেষ্টা, এবং একই সঙ্গে সম্পৃক্ত নারীর সঙ্গে সম্পর্কজনিত জটিলতা।" কিন্তু তাঁর মতে সমস্যা দুটি লঘুভাবে চিত্রিত হয়েছে, এবং অভিযানকারী চরিত্র "নরসিং আমাদের কায়িক শ্রমজীবী শ্রেণীর বিশ্বাসযোগ্য বলিষ্ঠ প্রতিভূরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নি।"

কিন্তু প্রশ্নটা এই, নরসিং-কে কি সত্যজিৎ রায় কায়িক শ্রমজীবী শ্রেণীর প্রতিভূরূপে উপস্থিত করতে চেয়েছিলেন? শেষ দৃশ্যে জোসেফ চলে যাওয়ার পর নরসিং-এর অরুন্তুদ আত্মজিজ্ঞাসা, এবং গুলাবীকে সুখনরামের কাছ থেকে ছিনিয়ে-নিয়ে যাওয়ার দৃশ্যে এই সত্যই মূর্ত হয়ে ওঠে যে নরসিং কোনো বিশেষ শ্রেণীর প্রতিভূ নয়, সেই শ্রেণীটির নৈতিকতার প্রতীক। নরসিং-কে যদি প্রলেতারিএতের প্রতিভূ বলা হয়, সেটা বোধহয় ভুল বলা হবে, সে প্রলেতারীয় নীতিবোধের প্রতীক। এবং 'অভিযান', প্রকৃতপক্ষে বুর্জোআ মায়া ভেদ করে প্রলেতারীয় নীতিবোধের, যথার্থ এবং সুস্থ মানবিকতার মুক্তি অভিযান।

প্রথম দৃশ্যেই নরসিংকে দেখা যায় তারই এক সহকর্মীর সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু সে-নরসিং কি সত্যিকারের নরসিং? তাই তাকে পর্দায় দেখানো হয় না, দেখানো হয় তার প্রতিবিম্বকে। নরসিং যদিও মোটর ড্রাইভার, এবং অপর মদ্যপায়ী নস্করও তাই—তাহলেও নরসিং নিজেকে তার সঙ্গে

একাত্ম ভাবে না। নস্কর বোঝায়, তারা দুজনেই মোটর ড্রাইভার, দুজনেই ট্রিপ দিচ্ছে—তফাৎটা কোথায়? নরসিং মানে না; সে হলো রাজপুত, আভিজাত্য তার বংশগত, সে 'ভদ্রলোক', নস্করের মতো ছোটোলোক ড্রাইভার নয়। প্রথমেই তাই সত্যজিৎ রায় দেখিয়ে দেন, নরসিং মোটেই সাধারণ বা গড়পড়তা প্রলেতারিএত নয়, তার মধ্যে এঙ্গেল্‌স্‌-কথিত একপ্রকার "bourgeoise 'respectability'" রয়েছে। তাই সে 'তুমি' বললে ক্ষেপে যায়, 'মিস্টার সিং, জেণ্ট্‌ল্‌ম্যান' হবার ইচ্ছা তার অদম্য। একা নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছিল নরসিং, তিন বছরের চেষ্টায় সার্ভিস খুলেছিল, বুর্জোআ দুলালবাবু একচেটিয়া কারবার খোলায় তার অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে গেলো। "শালারা দাঁড়াতে দেবে না, নিজের পাওমে দাঁড়াবে তো মার ডাণ্ডা"—এখানে কিন্তু নরসিং-এর বুর্জোআ-বিরোধী স্বরূপ পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

কিন্তু ভদ্রলোক হতেই হবে। যে শ্রেণীকে সে অন্তরে অন্তরে ঘৃণা করে, তাদেরই সমগোত্রীয় তাকে হতে হবে। (বিলেতের রাগী ছোক্‌রাদের উপন্যাসবিশেষের নায়কের মতো) ঘরের ছেলের ঘরে ফেরা হলো না, পাকচক্রে নরসিং জড়িয়ে পড়ল সুখনরামের সঙ্গে। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি—শুধু সার্ভিস খোলা নয়, একেবারে তিন মাসের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতার ভিত্তিতে ট্রান্সপোর্ট কম্পানির একচেটিয়া কারবারে অংশীদার হওয়ার সুযোগ। হায়রে! যে-একচেটিয়া কারবারের প্রকোপে তাকে কারবার গুটোতে হলো, শ্যামনগরে সে আবার সেই একচেটিয়া কারবারেরই অংশীদার হচ্ছে! ভদ্রলোক হওয়ার আকাশকুসুমে সে প্রথমেই বিসর্জন দিল তার স্বভাবজ মানবিক নীতিবোধ, অবহেলা করল গুলাবীর প্রেম, স্বীকার করল আফিম চালান দেওয়ার বেআইনী দুর্নীতিমূলক কাজ করতে। বুর্জোআ-ভবনের স্বপ্নসাধে নরসিং ভুলল তার স্বাভাবিক প্রলেতারীয় সত্তাকে।

যে-লাইটার গ্রহণের মাধ্যমে সত্যজিৎবাবু প্রলেতারীয় নৈতিকতার বর্জন প্রতিভাত করেছিলেন, সে লাইটার কিন্তু বারবার ধরিয়ে দিয়েছে—এ মেকী, এ খাঁটি নয়। সন্দেহ করেছে বাস-ড্রাইভার, জোসেফ, সবাই। প্রলেতারিএতের এ বুর্জোআত্বের ভান কারুর কাছে ঢাকা পড়ে নি। শেষ দৃশ্যেও নরসিং-এর আত্ম-উপলব্ধি বোঝানোর জন্য সত্যজিৎবাবু সেই প্রতীকেরই ব্যবহার করেছেন, লাইটারটা বিসর্জন দেওয়ায় তার সেই প্রাকৃত সত্তার পুনরুজ্জীবনই পরিস্ফুট হয়েছে। অনিকেত ফিরেছে ঘরে।

মোহের কি শেষ নেই? নরসিং তার সেই প্রিয়তম গাড়ি, ক্রাইসলার ৩০-কেও ভদ্রলোক হবার আশায় ছেড়ে দিতে রাজি আছে! একটু দুঃখ অবশ্য হয়, কিন্তু ভদ্রলোক হবার রঙীন স্বপ্নের কাছে সে কিছুই নয়। থাক গাড়ি। রামা পারল না, গাড়ি ছেড়ে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব। তবু মোহাচ্ছন্ন নরসিং-এর মোহভঙ্গ হলো না। জেনে শুনে চলল আফিম চালান দিতে। এসে দাঁড়াল গুলাবী। 'এতে পাপ নেই?' কিন্তু নরসিং অন্ধ। দুনিয়া জুড়ে পাপ চলেছে, সে তো নিমিত্তমাত্র। পাপ-পুণ্য ভালো-মন্দর বোধ তখন লুপ্ত হয়ে গেছে, সে ভদ্রলোক হতে চলেছে। পথে জোসেফ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ। কথা বলতেই ইতস্তত করছিল নরসিং, হঠাৎ ধরা পড়ে গেল জোসেফের ·কাছে। জোসেফ ত্যাগ করল তাকে। আর নরসিং? নির্বান্ধব জায়গার একমাত্র বন্ধু জোসেফ-কে ক্রুদ্ধ নরসিং মেরে বসল! ভদ্রলোক হতে গিয়ে এ কী অমানুষ হয়ে গেছে সে?

'সাবাস রাজপুত!' নরসিং-এর কি মনে পড়ে গেল আগের কথা? নিজের কাছে সে কি নিজেই বেইমানি করছে না? সে যে আজ একা! রামা নেই, গুলাবী নেই, জোসেফও চলে গেল। স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা —এ সব হারিয়ে সে কি করে বাঁচবে? ফিকে হয়ে এলো ভদ্রলো হবার, বুর্জোআভবনের বাসনা। সবাই চলে গেলে ট্রান্সপোর্ট কম্পানি নিয়ে সে কী করবে? . পাপ, অন্যায়—এ-পথে যদি ভদ্রলোক হতে হয়, তবে কী প্রয়োজন সেই ভদ্রলোক হওয়ায়? ফিরে আসবে সে, ফিরে আসবে আবার সেই লুপ্ত মনুষ্যত্বে, প্রত্যাবর্তন করবে প্রলেতারীয় নৈতিকতায়—যা বৈষয়িক সুবিধার জন্য পাপ-পুণ্য সমার্থক ভাবে না, ভাবে না বাঁকা পথে চলাটাই স্বাভাবিক, সোজা পথকে যে ন্যায়ের পথ বলে জানে। সুখনরামের গাড়ি থেকে গুলাবীকে ছিনিয়ে নিয়ে ঘরে ফেরায় সোচ্চার হয়ে ওঠে প্রলেতারীয় নীতিবোধের জয়, বুর্জোআ দুর্নীতির তুলনায় তার শ্রেষ্ঠতরতার কথা।

"আবার গিরিবর্ জে দেখা হবে"—বলে চলে যায় নরসিং, রামা আর গুলাবী, জোসেফকে ছুঁড়ে দেয় সুখনরামের সেই লাইটারটা।

এতে কি কোনো শ্রমজীবী শ্রেণীর কথা বলা হয়, না, উচ্চতর শ্রেণীর আরোহণের ভ্রান্তিবিলাসই প্রতিপন্ন হয়?

অতঃপর দ্বিতীয় প্রশ্ন, লঘুত্বের! হিউমারপ্রাধান্যের জন্যই কি নরসিঙের আচরণ হাস্যকর ঠেকেছে? কিন্তু, অন্তরে গভীরতা না থাকলে কী যথার্থ হিউমার আসে? নরসিং-এর ক্ষেত্রে যে-ভাষা বলা স্বাভাবিক, যা ভাবা প্রকৃতিসিদ্ধ—তা যদি আমাদের কাছে হাস্যকর ঠেকে, সেটাকে কোনো দোষ বলা যায় না। কারণ উচ্চতর শ্রেণী আরোহণের ইচ্ছাটাই হাস্যকর। এবং নরসিং-এর সঙ্গে রামার বিচ্ছেদ সাধনের পর হাসি আপনা থেকেই থেমে যেতে বাধ্য. গুলাবীর দৃপ্ত প্রত্যাখানে গভীরতা আরও কেলসিত রূপ নেয়, এবং জোসেফকে মেরে ফিরে আসার সময় তা কঠিন, প্রস্তরীভূত হয়ে ওঠে। পর্বতকন্দরে সেই 'জোসেফ' ডাকের প্রতিধ্বনি, নরসিং-এর ছুটতে ছুটতে ফিরে আসায় যে অসামান্য মুহূর্তগুলি রচিত হয়—তা তো ব্যাপারটার গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দেয়। অথবা যে সময়ে নরসিং লাইটারটি তুলে নেয়, বা ট্রান্সপোর্ট কম্পানি সংক্রান্ত কথাবার্তা বলে, সেখানে তো গাম্ভীর্যের কোনো অভাব ছিল না! মূল মুহূর্তগুলিতে যখন ত্রুটি নেই, তখন রসগ্রহণের ক্ষেত্রেই বা ক্ষতিটা কোথায়?

এ ছাড়া, ধ্রুববাবু একবার অনাবশ্যকভাবে 'অযান্ত্রিক'-এর উল্লেখ করেছেন। একমাত্র গাড়ির common factor ছাড়া আর কী কারণে যে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী ও ভিন্নবক্তব্য চিত্রের প্রতিতুলনা করা হয়—বুঝলাম না। 'অযান্ত্রিকের' মতো প্রথম শ্রেণীর ফিল্মে 'অভিযানের' বক্তব্য আরোপ করলে যে ফল হতো, 'অভিযানে' 'অযান্ত্রিকে'র গুণ নেই—বললে ব্যাপারটা ততোধিক খারাপ দাঁড়ায়।

বিদ্যুৎ মিত্র:

সঙ্গীত প্রসঙ্গ

শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে শেষ রোমান্টিক স্বরস্রষ্টা

ফ্রেডারিক ডেলিয়াস (১৮৬৩-১৯৩৪)

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই মারা গেলেন আর্থার স্থলিভান্। স্থলিভান্ ছিলেন এক স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তক স্বরকার, সৃজনশীল কন্সার্টো-রচয়িতা এবং জনপ্রিয় অপেরা পরিচালক। তাঁর মৃত্যুতে ইংলণ্ডের সঙ্গীতপ্রিয় সমাজে শোকের ছায়া পড়ে গিয়েছিল।

এডওয়ার্ড এল্‌গারের যুগ তখন। তাঁর 'ড্রিম অব জিরোন্‌টিয়াস্' সবে মঞ্চস্থ হয়েছে ; তাঁর স্বরসৃষ্টির খ্যাতিতে চতুর্দিক মুখরিত। এল্‌গারের মৌতাত কাটিয়ে উঠে অন্য স্বরকারের দিকে কান দেবার মতো তখন কারো মনের অবস্থা নয়। সাবেকী একঘেয়ে স্বরের পুনরাবৃত্তি এবং চটুল রস উৎপাদনের প্রচেষ্টা সঙ্গীতকে ক্রমশ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছিল। এই অবস্থায় বুদ্ধিজীবীরাও সঙ্গীতের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছিলেন। জর্জ বার্ণার্ড শ' ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা কতটা বলবার মতো জানি না, তবে কথা হলো লণ্ডনে সঙ্গীত জিনিসটা মরতে বসেছে।'

ফ্রেডারিক ডেলিয়াস নিজে ছিলেন ইংলণ্ডের সঙ্গীতের এই দুর্দিনের প্রত্যক্ষদর্শী। সঙ্গীত জগতের এই সংবর্ত তাঁকে প্রচণ্ডভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল। ডেলিয়াস ঠিক এই সময়েই স্বরসৃষ্টির জগতে প্রবেশ করলেন এবং তারপরই বোঝা গেল স্বরসৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি এক অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। বছর কয়েক আগে ডেলিয়াসের সঙ্গীত-কৃতির মুল্যায়ন করেছেন আধুনিক পাশ্চাত্য সঙ্গীত জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক ও স্বরকার টমাস্ বীচ্‌হাম। বীচ্‌হামের মৃত্যুর পর ডেলিয়াসের নাম আজ আবার লোকে ভুলতে বসেছে।

স্বরের উৎস

অসুস্থতা ও পারিবারিক নানারকম নির্যাতনের ভেতর দিয়ে ডেলিয়াসের শৈশব কেটেছে। কিন্তু তিনি সব ব্যথা বেদনার সান্ত্বনার উৎস খুঁজে পেয়েছিলেন প্রকৃতির মধ্যে। প্রথম জীবন তাঁর বৈষয়িক উন্নতির ব্যর্থ চেষ্টায় কাটে ; তারপর শুরু হয় তাঁর সঙ্গীতের জীবন। ছোটবেলা থেকেই মোৎজার্ট

ও শোপ্যার স্বর তাঁকে প্রচণ্ডভাবে আকৃষ্ট করত। স্বরের জগতে প্রবেশ করেই ডেলিয়াস ফ্লোরিডাতে ফিরে এলেন বসবাসের জন্যে। স্বরসৃষ্টির রহস্যের দ্বার এই সময়ই তাঁর কাছে উন্মুক্ত হয়। তিনি সর্বসময়ই বিশ্বাস করতেন যে, স্বর রচনা নির্ভর করে স্বরকারের ব্যক্তিগত অনুভূতির ওপর, বাইরের জগৎ ও পরিবেশ তাকে রূপ দিতে সাহায্য করে মাত্র। কোনো ব্যাকরণ, কোনো ধরাবাঁধা পদ্ধতি স্বরসৃষ্টির অপরিহার্য অঙ্গ বলে তিনি কখনই মেনে নেন নি। শেষ জীবন পর্যন্ত তাঁর মূলমন্ত্র ছিল : "composition like contemplation cannot be tought."

প্যারিসে কিছুদিন গগ্যাঁ ও স্ট্রিণ্ডবার্গের সান্নিধ্যে পেয়েছিলেন ডেলিয়াস্। গগ্যাঁর প্রিয় শিষ্যা জেল্‌কা রোশেনকে বিবাহ করার পর ডেলিয়াস্ জীবনের নতুন মূল্য খুঁজে পেয়ে ছিলেন। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত জেল্‌কা তাঁকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। গ্রেজ নামে একটি সুন্দর গ্রামে গিয়ে ডেলিয়াস্ দীর্ঘদিন অতিবাহিত করেছিলেন। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশই তাঁর অনুপ্রেরণার কেন্দ্র ছিল। 'ইন্ এ সামার গার্ডেন', 'সামার নাইট ইন এ রিভার' ও 'অন হিয়ারিং দি ফার্স্ট কুকু ইন স্প্রিং' তিনি এখানেই রচনা করেছিলেন। এই তিনটি রচনাই ইংলণ্ডের সঙ্গীত জগতে তাঁকে কিছুদিনের জন্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

স্বরের বৈশিষ্ট্য

আধুনিক কালে ইংলণ্ডের প্রায় কোনো অনুষ্ঠানেই সুখ্যাত সঙ্গীত-পরিচালকেরা ডেলিয়াসের স্বর পরিবেশন করেন না এবং স্বভাবতই তাঁর রেকর্ডও খুব দুষ্প্রাপ্য। বিভিন্ন বেতারকেন্দ্রে ডেলিয়াসের কোনো রচনাই শোনানোর রেওয়াজ না থাকায় ভারতীয় শ্রোতাদের কাছে ডেলিয়াসের পরিচয় এখনও প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সার টমাস্ বীচ্‌হামের কল্যাণে গত তিন বছর ধরে কখনও কখনও কদাচিৎ ডেলিয়াসের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির পরিচয় আমরা কিছু কিছু পেয়েছি।

ডেলিয়াসের সঙ্গীতের সর্বজনীন আবেদন না থাকার উৎস সন্ধান করতে গেলে একটা বিশেষ দিকে আমাদের দৃষ্টি যায়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে ডেলিয়াসের স্বর গভীর ধর্মীয় অনুভূতি থেকে উৎসারিত। কিন্তু আবার খুব বিস্ময়ের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করি যে, তিনি কখনও স্তোত্র

রচনায় নিযুক্ত থাকেন নি। এই কারণেই সম্ভবত চিরপ্রচলিত ধারা ও আঙ্গিকের আওতায় ডেলিয়াসের রচনা কখনও পড়ে নি। 'প্যারি' ও 'সং বিফোর সান্‌রাইজ' এই দুই রচনা শুনলে মনে হয় সবকিছু বন্ধন ছিন্ন করে প্রচণ্ডবেগে সুরের গতি যেন ছুটে চলেছে। ডেলিয়াসের জীবনের দ্বন্দ্ব এই দুই রচনায় খুব সজীব হয়ে উঠেছে। ডেলিয়াস সব সময়ই সঙ্গীতের নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং সেই কারণেই তাঁর রচনায় সহজ কোনো আবেদন নেই। মনে হয় অর্কেস্ট্রা ও সমবেত সঙ্গীতের মিশ্রণে 'অ্যাপোলেসিয়া' ডেলিয়াসের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। বীচ্‌হামের পরিচালনায় এই সৃষ্টি যেন অনবদ্য হয়ে উঠেছে। 'অ্যাপোলেসিয়া' উত্তর আমেরিকার প্রাচীন রেড্ ইণ্ডিয়ান নাম। মিসিসিপি নদীর গতির ছন্দের একটা কাল্পনিক রূপায়ণ এই সুরের তাল ও লয়ের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। অতীতের নিগ্রো ক্রীতদাসদের অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত জীবনের এক অসামান্য ছবি ডেলিয়াসের সুরের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। হারমনির দিক দিয়ে বিচার করলে পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের ইতিহাসে এমন মহান্ সৃষ্টির দৃষ্টান্ত বিরল।

'ব্রিগফেয়ার' সিম্‌ফনি ডেলিয়াসের সঙ্গীতবহুল জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। দুজন গ্রাম্য প্রেমিক-প্রেমিকার সুখাবিষ্ট জীবনের কয়েকটি মুহূর্তই এই সৃষ্টির প্রাণ। এই সঙ্গীতের ছন্দে ছন্দে জীবনের স্পন্দন অনুভব করা যায়। রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টিতে এর অবদান অপরিমেয় :

"It was on the fifth of August
The weather fine and fair
Unto Brigg fair I did repair
For love I was inclined,"

ডেলিয়াস নিজে একে 'ইংলিশ র‍্যাপ্‌সডি' বলে অভিহিত করেছেন।

বিদেশী সুরের প্রভাব

স্বদেশের লোকসঙ্গীত ও বিদেশী সুরের মিলন ঘটিয়ে ফ্রেডারিক ডেলিয়াস আধুনিক সুরস্রষ্টাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ফ্রান্সের সুরের সাবলীল ছন্দ এবং বিশেষ করে শোপ্যাঁর রীতিই তাঁকে প্রভাবিত করেছে। 'এ সং অব এ গ্রেট সিটি' ফ্রান্সে রাত্রিযাপনের এক নিবিড় অনুভূতির ওপর রচিত। নরওয়ের সঙ্গীতের প্রধান অঙ্গ তার প্রগাঢ় মাদকতা। ছন্দবিহীন বিষণ্ণ সুরই

নরওয়ের সুরের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই সুরের সঙ্গে ব্রিটেনের অর্কেস্ট্রা প্রয়োগ করে ডেলিয়াস 'ওয়ান্স্ আপন্ এ টাইম' রচনা করেছিলেন। সমবেত-সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও ডেলিয়াস অভিনব আঙ্গিকের সূচনা করেছেন। তাঁর 'এ ম্যাস অফ লাইফ' ও 'সী ড্রিফ্‌ট' আজও পৃথিবীর বিস্ময়। 'এ ম্যাস অফ লাইফ' নীট্‌শের 'দাজ্ স্পেক জরথুস্ট্র' প্রভাবে রচিত। এ সৃষ্টি যেন জীবনের জয়গান। অতিমানব জরথুস্ট্র হাসির শক্তি ঘোষণা করলেন উচ্চমানবতার কাছে। সুরের মধ্যে চাঞ্চল্য শুরু হলো যখন জরথুস্ট্র প্রেমের চিন্তায় মগ্ন হলেন। গ্রীষ্মকালের তাপদগ্ধ মধ্যাহ্নে জরথুস্ট্রের সব বিষাদের অবসান ঘটল, কিন্তু রাত্রির দুঃখের রহস্য তিনি উপলব্ধি করলেন—"Joy craves eternal, never-ending day." হুইটম্যানের 'সী ড্রিফ্‌ট'-এর বেদনাময় কাহিনীর সমস্ত সূক্ষ্ম সংবেদনকে ডেলিয়াস আশ্চর্য কৃতিত্বের সঙ্গে শ্রুতিসুখকর করে তুলেছেন। 'এ ভিলেজ রোমিও জুলিয়েট' পাশ্চাত্ত্য অপেরার ইতিহাসে এক অক্ষয় সৃষ্টি।

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত ও ডেলিয়াস্

ডেলিয়াসের পর থেকে পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের ইতিহাসে প্রচণ্ড বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। বিংশ শতাব্দীর সঙ্গীতের যে ধারা তাতে 'জ্যাজ্'-এর প্রভাবই বেশি লক্ষ্য করা যায়। চটুল সুরসৃষ্টির উন্মাদনায় আজকের জগতের সুরকারেরা দীর্ঘ সময় নিয়োগ করে থাকেন এবং ডেলিয়াসের সৃষ্টি যেন এর বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। তার সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে রোমান্টিকতার ছাপ স্পষ্টভাবে অনুভবগম্য এবং তা অন্তর স্পর্শ করে। স্বপ্নময় আত্মস্থ চৈতন্যের পরিবেশ সৃষ্টিতে তাঁর দক্ষতায় শ্রদ্ধা অনুভব না করে পারা যায় না। ডেলিয়াসের জীবনের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে তাঁর অবদান অকুণ্ঠ চিত্তে স্মরণ করি।

সুহাস চৌধুরী

নাট্য প্রসঙ্গ

ব্রিস্টল ওল্ড ভিকের অভিনয়

বিদেশী শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গে আমাদের চাক্ষুষ পরিচয়ের পথ নানা কারণে বন্ধুর; তবু পরিবহনের সমস্যা কম বলে সচেষ্ট হয়ে সে পথ কালেভদ্রে সুগম করা সম্ভব হয়। কিন্তু বিদেশী নাট্যশিল্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের উপায় সঙ্কীর্ণতর হয়েছে প্রধানত পরিবহনের ঝামেলা থাকায়। সত্যজিৎ রায়ের কোনো ছবি সহজেই ইউরোপ আমেরিকায় দেখানো যেতে পারে, কিন্তু 'রক্তকবরী' বা 'পুতুল খেলা'-কে ইউরোপীয় দর্শকের সামনে উপস্থিত করায় হাজার বাধা। তাছাড়া মূলত দৃশ্যবাহী হওয়ায় চলচ্চিত্রের আবেদন সহজে বিশ্বজনীন করা যায়—ভাষান্তর, সহলিপি ইত্যাদি যান্ত্রিক উপায়ে তা সহজতর করা যায়। কিন্তু মূলত বাক্যবাহী হওয়ায় নাটকের পক্ষে আঞ্চলিকতার গণ্ডি অতিক্রম করা কঠিন হয়ে পড়ে।

অবশ্য ইংরেজি নাট্যাভিনয়ের রসগ্রহণে ভাষার পার্থক্য এদেশের শিক্ষিত সমাজের কাছে প্রধান অন্তরায় নয়। গ্যারিক—আর্ভিং—টেরী—থর্নডাইক—গিলগুড—রেডগ্রেভ—অলিভারের দেশের নাট্যাভিনয় দেখতে স্বভাবতই আমরা উৎসুক হয়েই থাকি। দুর্ভাগ্যবশত সুযোগ ঘটে অল্প এবং সাধারণত যাঁরা আসেন তাঁরা সে দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনয়ক্ষমতার পরিচয় বহন করেন না। এ অবস্থায় ব্রিস্টল ভিকের ভারত-আগমনের বার্তা স্বভাবতই আমাদের উদগ্রীব করেছিল।

শেক্সপীয়রের নাটক অভিনয়ে অসামান্য দক্ষতা অর্জন করা সত্ত্বেও লণ্ডনের ওল্ড ভিককে ব্যবসাগত পরাভবের দরুন লণ্ডন ছেড়ে পথে বেরোতে হয়েছিল। এককালে এতে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ অভিনেতারা অভিনয় করতেন। আজও এঁদের অনেকে দেশে দেশে অভিনয় করে বেড়ান—সম্প্রতি মিশরে গ্রীক নাটকের অভিনয় করেছেন, ভিভিয়ান লী ছিলেন প্রধান অভিনেত্রী। পুরনো দলের একটি শাখা 'আর্টস্ কাউন্সিল অব গ্রেট ব্রিটেন'-এর উদ্যোগে ব্রিস্টলের থিয়েটার-রয়ালে ১৯৪৬ সালে অভিনয় শুরু করে। এই হলো 'ব্রিস্টল ওল্ড ভিক'-এর জন্মকথা। ব্রিস্টলের অধিবাসীরা বহুকাল থেকে নাট্যসচেতন। থিয়েটার-রয়াল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৭৬৬

খ্রীষ্টাব্দে; আর এই মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন গ্যারিকের মতো অভিনেতা। অতএব, এই দল যে বিশেষভাবে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ নাট্যশিল্পের ঐতিহ্যবাহী—এ বিশ্বাসের ভিত্তি আছে।

তিনটি মাত্র অভিনয়ের জন্য নাটক নির্বাচনে এঁরা সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। শেক্সপীয়র তর্কাতীতভাবে অপরিহার্য। আধুনিকতার পথিকৃৎ হিসাবে বার্নাড শ-র তাৎপর্য অনস্বীকার্য, আর আধুনিক পর্বে রাগী ছোকরাদের বিক্ষোভের বদলে এঁরা নিও-ক্লাসিসিস্টের মননশীলতাকে মঞ্চে উপস্থাপিত করে ভালো করেছেন।

'হ্যামলেট'-এর জনপ্রিয়তা বহুকাল থেকেই কিংবদন্তীর আকার ধারণ করেছে। এই নাটককে কেন্দ্র করে বিদগ্ধকুলের বাগবিতণ্ডাও সুপরিচিত। ব্রাডলির দার্শনিক আলোচনাতে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়ে জে. এম. রবার্টসন বলেন, 'It (Hamlet) makes superb entertainment' কিন্তু 'it leaves the critical intellect unsatisfied'. টি এস. এলিয়ট-এর মন্তব্যও এই ধরনের। ট্র্যাজেডি হিসাবে 'হ্যামলেট'-এর শ্রেষ্ঠত্ব পরিমাপের উপযুক্ত ক্ষেত্র এটা নয়, কিন্তু শেক্সপীয়রের একটিমাত্র নাটক অভিনয় করতে হলে 'হ্যামলেট'-এর নির্বাচন নিতান্ত অযৌক্তিক নয়। পরিচালক ডেনিস কেরী এ নাটকটিকে এলিজাবেথান্ সারল্যের সঙ্গে উপস্থাপিত করেছিলেন। অল্প সরঞ্জাম আর অল্প জনবল নিয়ে রাজসভা, কবরখানা, মূকাভিনয়ের দৃশ্যগুলি সুষ্ঠুভাবে রচিত হয়েছিল। হ্যামলেটের ভূমিকায় ২৯ বছর বয়স্ক সুদর্শন অভিনেতা ব্যারী ওয়ারেনের অভিনয় অন্তরস্পর্শী হয়েছিল। তাঁর চিত্রণে দার্শনিক বা বিজ্ঞ হ্যামলেটকে না পেয়ে অনেকে তাঁকে 'আধুনিক রাগী-ছোকরা হ্যামলেট' বলে ঠাট্টা করেছেন, কিন্তু অস্থিরচিত্ত যুবকের আত্মদাহ তাঁর অভিনয়ে বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রকট হয়েছিল। সকলেই জানেন, বিচিত্র ও সমৃদ্ধ ডাইমেনশন-সম্পন্ন এইসব চরিত্র বিভিন্ন অভিনেতার বিভিন্ন ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। ওয়ারেনের ব্যাখ্যায় বিশেষ শক্তিমত্তার পরিচয় ছিল—দুঃখের বিষয়, দু-একটি জায়গায় মার্কিনী ঢঙের উচ্চারণ কর্ণপীড়ার কারণ হয়েছে। সমৃদ্ধ কণ্ঠস্বরের অধিকারী অলিভার নেভিল্ ক্লডিয়াসের চরিত্রে বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এই দুজনের প্রশংসনীয় ব্যক্তিগত অভিনয় সত্ত্বেও হ্যামলেট শেষ পর্যন্ত সার্থক হলো না অন্যান্য চরিত্রের দুর্বল অভিনয়ের জন্য। পোলেনিয়াসকে হাজির করা হয়েছিল

বিদূষকের মতো; গার্ট্রুড আর ওফেলিয়ার প্রাণহীন অভিনয় দেখে তাঁদের মঞ্চঅভিজ্ঞতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগা অন্যায় নয়। ওফেলিয়ার চরিত্রে সারা বাডেল নিজেকে সুগায়িকা বলে পরিচিত করলেন মাত্র, বাকি সময়ে তিনি মঞ্চে দাঁড়িয়ে সহ-অভিনেতৃবর্গের অভিনয় উপভোগ করেছিলেন। গার্ট্রুড রূপে ইভান্ কোলেং (পরিচালক ডেনিস ক্যারীর স্ত্রী) কোনোরকমে পংক্তিগুলি আবৃত্তি করে গেলেন মাত্র, তাঁর অক্ষমতার জন্য শয়নকক্ষে 'হ্যামলেট'-এর সুঅভিনয় সত্ত্বেও প্রত্যাশিত নাটকীয় সংঘাত সৃষ্টি হলো না। প্রেতাত্মার পরিকল্পনাটি কৌতুকবহ হয়েছিল।

অপটু অভিনয়ের জন্য শ-এর 'আর্মস্ এণ্ড দি ম্যান'ও শেষ পর্যন্ত বিশেষ সার্থক হয় নি। শ-এর নাটক সম্পর্কে ডাইড্যাক্টিক বা 'দেখবার নয়, পড়বার' বলে যে বদনাম বা সুনাম প্রচলিত আছে সেটা অন্ততপক্ষে 'আর্মস এণ্ড দি ম্যান' সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। এ নাটককে মঞ্চসফল করা খুব কঠিন কাজ নয়, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে সে সফলতা অর্জিত হয় নি। প্রযোজনাগত গুণপণার পরিচয় এতে কিছু কিছু ছিল। ফ্রেমের সাহায্যে রাইনার শয়নকক্ষের সেট্ বেশ ভালোভাবে নির্মিত হয়েছিল—সে দৃশ্যে আলোকসম্পাতেও কল্পনাশক্তির ছাপ ছিল। বাগানের দৃশ্যটি বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য বা শিল্পসম্মত হয় নি। পেট্রকফের লাইব্রেরির দৃশ্যটি আসবাবপত্রে যথাযথ হয়েছিল বটে, কিন্তু বই-এর তাকে হাল আমলের 'পেঙ্গুইন পেপারব্যাক' পরিষ্কারভাবে দেখা গিয়েছে! এ-জাতীয় 'অ্যামেচারশিপ' ত্রুটি কোনো কুশলী দলের কাছ থেকে নিশ্চয়ই অপ্রত্যাশিত নয়, তবে সু-অভিনয়ে এ-জাতীয় দোষ ঢেকে দেওয়া যেত। কিন্তু রাইনার (সারা বাডেল) অভিনয় নিতান্তই দুর্বল হওয়াতে এ নাটকের অ্যান্টি-রোমান্টিক কমেডির কৌতুক ফুটে ওঠবার সুযোগই পায় নি। রোমান্টিক আতিশয্য যথাযথভাবে চিত্রিত না করলে অ্যান্টি-রোমান্টিক কমেডির মেজাজ তৈরি হবে কী উপায়ে? ব্লান্‌স্‌লির ভূমিকায় জন্ বিংহাম আর পেট্রকফের ভূমিকায় হিউ মানিং-এর ব্যক্তিগত অভিনয় বিশেষভাবে উপভোগ্য হওয়ায় শেষ পর্যন্ত নাটক কোনোরকমে উৎরে গেছে।

কিন্তু শ বা শেক্সপীয়রের উপস্থাপনায় আশানুরূপ কৃতিত্বের পরিচয় না দেওয়ার অভাব পুরিয়ে দিয়েছেন এঁরা রবার্ট বোল্টের 'এ ম্যান ফর অল সিজন্‌স্'-এর উপস্থাপনার অসামান্য সাফল্যে। বছর দশেক আগে

ইংরেজি নাটকের জরদ্গবদশার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে নবতরঙ্গের সৃষ্টি করেছিলেন 'রাগী ছোকরার দল'—অস্‌বোর্ন-এর 'লুক ব্যাক্ ইন্ অ্যাঙ্গার' ও-দেশের নবনাট্য আন্দোলনে 'নবান্ন'-এর কাজ করেছিল। কিন্তু নিম্নবিত্ত শ্রেণীর ক্রোধের প্রকাশকে মূলধন করে বসে থাকা নবনাট্যকারদের পক্ষে বিশেষ বিধেয় বলে মনে হলো না—তাদের কল্পনা বৃহত্তর ও মৌলতর বিষয়বস্তুর অনুসন্ধানী হলো। সমসাময়িক তুচ্ছতাকে অতিক্রম করবার পক্ষে ইতিহাস আশ্রয় করাই শ্রেয় বলে বিবেচিত হলো। স্বয়ং নাট্যকার বোল্টের ভাষায়: "An historical play relieves one of the shadows of Ibsen, O' Neill & S. Mangham, and puts one in the shadow of Shakespeare—a dangerous but exciting place for the play-wright to be. The reason why I wanted to unite in that style was that I wanted to unite about themes more fundamental than those afforded by a representation.... Historical characters are less likely to become bogged down in small idioms of behaviour."—এইভাবে নিও-ক্লাসিসিজমের সূত্রপাত করে ইংলণ্ডের নবনাট্যকার ব্রেথট্-এর কাছাকাছি আসবার চেষ্টা করছেন। এমন কি গতদশকের রাগী-ছোকরা অস্‌বোর্ন নাটক লিখেছেন লুথারকে নায়ক করে, যদিও সেখানে তাঁর উদ্দেশ্য আদর্শবাদী লুথারের খোলস ছিঁড়ে কামনাবাসনায় আক্রান্ত মানুষ লুথারের যন্ত্রণার উদ্‌ঘাটন। সে যাই হোক আধুনিক ইংরেজি নাটক শ্রমিকের রন্ধনশালার গণ্ডী অতিক্রম করে ব্যাপকতর দেশকাল অভিমুখী হয়েছে। বোল্ট তাঁর 'এ ম্যান্ ফর অল্ সিজন্‌স্' নাটকে টমাস মোর-এর চরিত্র উপস্থাপিত করেছেন রেনেসাঁস ম্যান-এর প্রতীক হিসাবে—তার মধ্যে অনমনীয় ব্যক্তিগত বিবেক আর উজ্জ্বল বুদ্ধির সমাবেশে এক অখণ্ড পুরুষ প্রত্যক্ষ করা গেছে। ব্রেথ্টীয় এপিক ড্রামার আদর্শে নির্মিত এই নাটক চিত্রনাট্যের মতো গতিসম্পন্ন এবং নাটকের আঙ্গিকের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এর উপস্থাপনায় পরিচালক ডেনিস্ কেরী প্রায় যান্ত্রিক নিয়মানুবর্তিতার পরিচয় দিয়েছেন। চলনের, আলোকসম্পাতের, অভিনয়ের সুসমঞ্জস সমন্বয়ে এক ত্রুটিবিহীন ড্রামাটিক প্যাটার্নের সৃষ্টি হয়েছিল। অভিনয়ে সকলেই বিশেষ পারদর্শিতার

প্রমাণ দিয়েছেন। ক্রমওয়েলের ভূমিকায় জন্ রিংহ্যাম, নরফোকের ভূমিকায় হিউ ম্যানিং এবং রিচের ভূমিকায় ব্যারী ওয়ারেনের নাম স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ্য, এবং টমাস্ মোর-এর চরিত্রে অলিভার নেভিলের অসামান্য অভিনয় মহত্ত্বের আস্বাদ এনেছিল। শুধুমাত্র এই নাটকটি প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ দেবার জন্য ব্রিটিশ কাউন্সিল আর হুমায়ুন থিয়েটার্স আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন।

পরিশেষে একটি কথা বেদনার সঙ্গে নিবেদন করছি। কলকাতার একটি নাট্যমঞ্চে ওল্ড ভিক দলকে যে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়, সে সভায় শ্রীতাপস সেন ছাড়া আমাদের নাট্য আন্দোলনের কোনো যোগ্য প্রতিনিধিকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায় নি। আর বিদেশী অতিথিদের যে নাটকের ('সেতু') অংশবিশেষ দেখানো হয় গুণগত বিচারে তার চেয়ে নিঃসন্দেহে ভালো কিছু আমরা অতিথিদের কাছে পরিবেশন করতে পারতাম। বিদেশীরা আমাদের নাট্যশিল্প সম্পর্কে যে ধারণা নিয়ে গেলেন তার আভাস পাওয়া গিয়েছিল তাঁদের ব্যাজস্তুতিতে। অথচ লজ্জার বিষয়, তাকেই স্তুতি ভেবে বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করতে আমরা কুণ্ঠিত হই নি। 'বহুরূপী' বা 'লিটল থিয়েটার'-এর নাটকের নির্বাচিত দৃশ্যাবলী পরিবেশনের ব্যবস্থা করা কি একেবারেই অসম্ভব ছিল?

ধ্রুব গুপ্ত

চলচ্চিত্র প্রসঙ্গ

ফিল্ম-সোসাইটি আন্দোলনের নতুন ধাপ

ভারতবর্ষে ফিল্ম-সোসাইটি আন্দোলনের বয়স অবশ্য বেশি নয়। কিন্তু গত কয়েক বছরের মধ্যেই এ আন্দোলন যথেষ্ট শক্তি অর্জন করেছে। সারা দেশে এখন প্রায় তিরিশটি ফিল্ম-সোসাইটি কাজ করছে এবং আরও কয়েকটি শীগগিরই কাজ আরম্ভ করবে। দশবছর আগেও ফিল্ম-সোসাইটি আন্দোলন আজকের মতো ব্যাপক ছিল না। তৎকালীন চলচ্চিত্র আন্দোলনে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান সত্ত্বেও লোকে মনে করত ফিল্ম-সোসাইটি হচ্ছে মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীর আড্ডাখানা আর চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ীরাও এটাকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। সাধারণ লোক কিংবা সরকারী মহল তো চলচ্চিত্র সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়কেই প্রাকৃত ব্যাপার বলে মনে করতেন। প্রথম যুগে ফিল্ম-সোসাইটি আন্দোলনের অগ্রগামীদের মনে এই করুণ অভিজ্ঞতার স্মৃতি এখনও উজ্জ্বল। সেই অবস্থার প্রতিতুলনায় ফিল্ম-সোসাইটি আন্দোলনের এখনকার চেহারা নিঃসন্দেহে সাধারণ্যে চলচ্চিত্র চেতনার অগ্রগতির দ্যোতক। বর্তমানে কলকাতাতেই দুটি চলচ্চিত্র-সঙ্ঘের সভ্য সংখ্যা প্রায় দু হাজারের কাছাকাছি। সব মাসেই ছবি দেখানো হয়, আলোচনাচক্রের অধিবেশন, পত্রিকা প্রকাশিত হয়, চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞদের বিশেষ বক্তৃতামালার আয়োজনও করা হয়। সমস্ত মিলে মনে হয় এখন এ আন্দোলন আরো জীবন্ত, আরো জোরদার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অবশ্য এ আন্দোলনের প্রধান সমস্যাগুলো এখনও বর্তমান। প্রতি ফুটে ছাপ্পান্ন নয়া পয়সা সরকারী শুল্ক দিয়ে ছবি আমদানী করা ফিল্ম-সোসাইটির পক্ষে সম্ভব নয়। তারপর সেন্‌শরশিপের দৌরাত্ম্য ও চড়া হারে সেন্‌শরশিপ ফী (প্রতি রীল চল্লিশ টাকা হিসেবে) তো আছেই। সরকারী চলচ্চিত্রাগারেও (দিল্লীস্থ "সেণ্ট্রাল ফিল্ম লাইব্রেরি") ছবির সংখ্যা খুবই নগণ্য। বিদেশী দূতাবাসগুলো অবশ্য এ ব্যাপারে খুবই সাহায্য করেন, কিন্তু এর ফলে অনুষ্ঠান-সূচী একেবারেই অনিশ্চিত থাকে এবং চলচ্চিত্র অনুশীলনও হয় বিক্ষিপ্ত। এই অসুবিধেগুলো দূর না করতে পারলে ফিল্ম-সোসাইটি আন্দোলন খুব বেশি এগোতে পারবে না।

অবশ্য এই বাধাগুলো একক প্রচেষ্টায় দূরীভূত হবার নয়। এর জন্য সংহত প্রচেষ্টা দরকার। আর, এই সমবেত প্রয়াসই ভারতের অধিকাংশ ফিল্ম-সোসাইটির সম্মেলনে গঠিত "ফেডারেশন অফ ফিল্ম-সোসাইটিজ অফ ইণ্ডিয়া"র ভেতর দিয়ে রূপায়িত হয়েছে। সত্যজিৎ রায়ের সভাপতিত্বে গঠিত এই সংস্থা (এর প্রধান কার্যালয় কলকাতায়) ভারতের ফিল্ম-সোসাইটি আন্দোলনের কেন্দ্র-বিন্দু হিসেবে কাজ করছে। এই কেন্দ্রীয় সংস্থাটি সঙ্গীত-নাটক-আকাদমি ও ভারত সরকার থেকে আর্থিক সাহায্য পাচ্ছে আর এর নিজস্ব ইংরেজী মুখপত্রও ("ইণ্ডিয়ান ফিল্ম কালচার") প্রকাশমান। অবশ্য ফেডারেশনের সবচেয়ে বড় কাজ হলো বছরে নির্দিষ্ট সংখ্যক ছবি বিনাশুল্কে আমদানী করবার অনুমতি আদায় করা। এর ফলে এ বছরের শেষের দিকেই সর্বকালের কয়েকটি বিখ্যাত চলচ্চিত্র-নিদর্শনের সঙ্গে ফিল্ম-সোসাইটি সদস্যদের পরিচয় হবে। এ গুলোর মধ্যে আছে "মাদার" (পুদভকিন) "প্যাশন অফ জোয়ান অফ আর্ক" (কার্ল ড্রেয়ার) "ক্যাবিনেট অফ ডঃ ক্যালিগ্যরি" (রবার্ট ওয়াইন) "দি ইটালিয়ান স্ট্র হ্যাট" ও "লে মিলিঅঁ" (রেনে ক্লেয়ার) "দি লাস্ট লাফ" (মুরণাউ) "দি ব্লু এঞ্জেল" (স্টার্ণবার্গ) প্রভৃতি চলচ্চিত্র, যে সব ছবি এদেশে বসে দেখবার আশাই করা যায় না। এখন থেকে প্রতি বছরই এ ধরণের ছবি আনা হবে এবং ফেডারেশনের সমস্ত সদস্য-সংস্থাতেই তা প্রদর্শিত হবে। এ ছাড়া ফেডারেশন থেকে পুণার ফিল্ম-ইনষ্টিটিউট ও সেণ্ট্রাল ফিল্ম লাইব্রেরির চলচ্চিত্র-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করবার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে এবং সে সম্পর্কে সক্রিয় পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-সংঘ সংস্থা ("ইণ্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ") বৃটিশ ফিল্ম ইনষ্টিটিউট, আমেরিকার মিউজিয়ম অফ মডার্ণ আর্ট ও ফ্রান্সের সিনেমাথেক ফ্রাঁসেজ-এর সঙ্গেও ফেডারেশনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ এবং তাঁদের কাছ থেকে সক্রিয় সাহায্য লাভের আশাও উজ্জ্বলতর। দেশেও ফিল্ম-সোসাইটির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে লোকের আগ্রহ বেড়েই চলেছে এবং এই কেন্দ্রীয় সংস্থার নেতৃত্বে নিশ্চয়ই এ আন্দোলন ক্রমশই দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে।

অবশ্য ভাল ছবি জোগাড় করে দেখানোর মধ্যেই ফিল্ম-সোসাইটি আন্দোলন শেষ হয়ে যায় না। দেশে বর্তমানে চলচ্চিত্র-চিন্তার অনুশীলনকে জীইয়ে রাখা এবং তার সুপরিচালনার দায়িত্বও এড়িয়ে যাবার নয়। তা ছাড়া

দেশজ চলচ্চিত্রের অতীত নিদর্শনগুলির উদ্ধার এবং সেগুলোর যথোচিত সংরক্ষণ, ভারতীয় চলচ্চিত্রের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস-রচনা, সাধারণভাবে সেনসরশিপ নীতির পুনর্বিবেচনা এবং ফিল্ম-সোসাইটি-প্রদর্শনীর ছবিকে সেনসরশিপ থেকে মুক্তি দেওয়া (যা কি না প্রায় সব দেশেই হয়ে থাকে)—এইগুলি বিশেষ করে বিবেচ্য। চলচ্চিত্রের অগ্রগামী নেতাদের সঙ্গে চিত্ররসিকদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন, এগুলোও ফিল্ম-সোসাইটিরই কাজ। আশা করি ফেডারেশন সে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হবে না।

দুটি বিশিষ্ট ছবি : চ্যাপলিন

চ্যাপলিনের নামেই চিত্ররসিকমহলে সাড়া পড়ে। আর যে সব ছবির নাম শোনা আছে বা সে সম্পর্কে বহু জায়গায় পড়া গেছে সে সব ছবি দেখবার সুযোগ এলে একটা কেমন প্রত্যাশিত উত্তেজনা বোধ হয়। সম্প্রতি ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি প্রদর্শিত চ্যাপলিনের "দি কিড" ছবিটি দেখেও অনেকেই নিশ্চয় সেরকম মুগ্ধ বিস্ময় বোধ করেছিলেন। "দি কিড" (১৯২১ সালে তোলা চ্যাপলিনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ছবি) এর আগে স্ল্যাপষ্টিক কমেডির জনক ম্যাক সেনেটের পরিচালনায় ও তার পরে কিছু দিন নিজে ছোট ছোট ছবি তৈরি করে চ্যাপলিন তখনই যথেষ্ট বিখ্যাত। চ্যাপলিনের সৃষ্টির দার্শনিক ভিত্তি "দি কিড" ছবিতেই প্রথম প্রকাশিত এবং সেই বিখ্যাত ভবঘুরে চরিত্রটিও তার পুরো চেহারা নিয়ে এই ছবিতেই প্রথম উপস্থিত। (এর আগে "দি ট্র্যাম্প" নামে ছোট ছবিটিতেও অবশ্য তার দেখা পাওয়া গেছে)। রাস্তার এক ছন্নছাড়া চরিত্র আর কুড়িয়ে পাওয়া একটি শিশুর (এই চরিত্রে জ্যাকি কুগানের অভিনয় অনবদ্য) মধ্যে আস্তে আস্তে গড়ে ওঠা এক অদ্ভুত মমত্বময় সম্পর্ককে কেন্দ্র করে "এক টুকরো হাসি আর একফোঁটা অশ্রুজল" নিয়ে এ ছবি রচিত। এই ভবঘুরের মধ্যে অবশ্য ভের্দুর তিক্ততা কিংবা ক্যাল্‌ভেরোর প্রৌঢ় বিষাদ প্রাপ্য নয়। সদানন্দ এই লোকটি নিজের খেয়ালে চলে। অনাহার অর্থাভাব কিছুই তাকে দমাতে পারে না। এই চরিত্র আর তার চারপাশের জগৎকে চমৎকার ভাবে এঁকেছেন চ্যাপলিন তাঁর ছবিতে। অভিনয় ভঙ্গীতে মোটামুটি নির্বাক চলচ্চিত্রের কৌতুক-অভিনয়ের ধারাই অবলম্বিত। চার্লি ও জ্যাকির সেই বিখ্যাত দৌড়, চার্লির অপরূপ মূকাভিনয় জানলা-সারানোর দৃশ্যের দমফাটানো মজা, পরকীয়ালোভী চার্লির দুরবস্থা,

চার্লি ও জ্যাকির প্রাতরাশের বথরা, এই দৃশ্যাংশগুলির মজা তো ভুলবার নয়। এর পাশাপাশিই আবার ভবঘুরের স্বপ্নস্বর্গ নির্মাণ, নির্জন পার্কে মা যখন ফেলে-যাওয়া-ছেলের খোঁজ করতে আসেন, খৃষ্টের ক্যালভারী-যাত্রা চিত্রের প্রয়োগ, এরকম নানা জায়গায় কৌতুকের আড়ালে ছবিটির মৌল গভীরতাও নজর এড়ায় না। এরপর প্রতি ছবিতেই অবশ্য চ্যাপলিন-প্রতিভার বিভিন্ন স্তর বিকশিত, তাঁর ক্ষমতার প্রথম স্বাক্ষর হিসেবে "দি কিড" ছবিটি নিশ্চয়ই স্মরণীয়।

যুদ্ধোত্তর পূর্ব-জার্মানির চলচ্চিত্র-শিল্পে অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। জার্মান চলচ্চিত্রের ঐতিহ্যগত দৃশ্যধর্মিতা এবং বাস্তবচেতনা পূর্ব-জার্মান চলচ্চিত্রে উত্তরাধিকারসূত্রে এসেছে। এর সঙ্গে কাজ করেছে রুশ চলচ্চিত্রের সৃষ্টিশীল প্রভাব। এর ফলে গত কয়েক বছরের মধ্যেই এ দেশের ছবি সারা পৃথিবীতেই নাম করেছে এবং যে কটি নিদর্শন আমাদের দেখবার সুযোগ হয়েছে (এ প্রসঙ্গে উলফ্‌গাঙ স্টাউড্‌টের "মার্ডারারস্‌ আর অ্যামং আস্‌", "দি আণ্ডারডগ", কুর্ট-ইউং-অ্যালগেনের "ডিউপড্‌ টিল ডুম্‌স্‌ডে", "লিজি" ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য) তাতে পূর্ব-জার্মান চলচ্চিত্রের উৎকর্ষ নিঃসন্দেহেই প্রমাণিত। কনরাড্‌ উলফ্‌ নির্মিত "স্টার্স" ছবিটি এই দেশের চলচ্চিত্র-পঞ্জীতে আর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ছবিটি সিনে ক্লাব অফ্‌ ক্যালকাটার উদ্যোগে কয়েকদিন আগে দেখানো হয়েছে। কনরাড উলফের (ইনি দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-উৎসব উপলক্ষে কলকাতায় আসেন এবং এঁর পরিচালিত "প্রফেসর মামলক"-এর পুনর্নির্মিত সংস্করণ ঐ উৎসবের অনুষ্ঠান-সূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল) চিত্রনাট্য স্বচ্ছন্দ ও গতিময়, আবহনির্মানদক্ষতা ও সংযত চরিত্রায়ণ ছবিটিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। জার্মান যুদ্ধবন্দীশিবিরে একটি নাৎসী সৈনিক ও এক ইহুদী যুবতীর প্রেমকে কেন্দ্র করে রচিত এ ছবির প্রতি দৃশ্যে যুদ্ধের বীভৎসতা প্রকাশিত, অথচ কোথাও পরিচালক সোচ্চার নন। এমন কি একটা গুলির শব্দও বোধহয় শোনা যায় নি কোনো দৃশ্যে। অথচ সমস্ত ছবিতেই সব সময় একটা অশরীরী ভয়, একটা রুদ্ধশ্বাস আতঙ্কের ছায়া উপস্থিত। ইহুদীদের খানাতল্লাসির দৃশ্যের চাপা নিষ্ঠুরতা, যুদ্ধবন্দীদের গ্লানিময় জীবন, নাৎসী বিকৃতির প্রতিমূর্তি সেই লোকটি অন্ধকারে প্রেমিক-প্রেমিকার পিছু নেওয়া যার কাজ, অস্‌উইৎস্‌ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে যাবার সময় ট্রেনের দরজায় তালা লাগানো এবং খোলা হাওয়ার জন্য শিশুদের আকুলিবিকুলি, এরকম নানা দৃশ্যে শব্দ ও চিত্রের সমাহারে গঠিত এক সংহত কাব্যসুষমার ছাপ পাওয়া যায়।

মৃগাঙ্কশেখর রায়

পু স্ত ক প রি চ য়

The Lyric in IndiaPoetry—by Alokeranjan Das-Gupta; Firma K. L. Mukhopadhyay, Calcutta.

ছোট একটি প্রবন্ধ গ্রন্থ—মাত্র ১৩৬ পৃষ্ঠার; কিন্তু আলোচনাটি গভীর, ব্যাপক অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানের পরিচায়ক। জিজ্ঞাসা ছিল—ভারতীয় 'লিরিক'-এর, বিশেষ করে বাঙলা লিরিক-এর জন্মকথা। আধুনিক ভারতীয় ভাষায় এসব কবিতার জন্মকালে ভারতীয় রাগ-সঙ্গীতের সঙ্গে তাদের কোনো সম্বন্ধ ছিল কি? আর, মিত্রাক্ষর বা অন্ত্যানুপ্রাসই বা ভারতীয় কবিতায় কবে থেকে এল, এল কি করে। এই জিজ্ঞাসার সূত্রে অবশ্য লেখকের প্রধান একটি অনুসন্ধেয় বিষয় হয়ে উঠল এই—বাহ্যত রাধাকৃষ্ণ বা অনুরূপ প্রেমলীলার কাঠামোর মধ্যেও কেমন করে বিশিষ্ট কবির বিশিষ্ট সত্তার আভাস ফুটে উঠেছে এই সব কবিতায়।

প্রবন্ধটি ইংরাজিতে লেখা। লিরিক কথাটি নিয়ে তাই লেখকের বেগ পেতে হয় নি। কিন্তু বাঙালী পাঠকের পক্ষে চলতি অনুবাদে লিরিক অর্থ হচ্ছে গীতিকাব্য বা খণ্ডকাব্য। এই প্রথম শব্দটি যদি বা গ্রাহ্য হয়, দ্বিতীয় শব্দটি কিন্তু এই আলোচনায় একটি বিশিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে: যা খণ্ড বা অংশ, আপনাতে সম্পূর্ণ নয়, এমনি কবিতাই খণ্ড কবিতা। অথবা, আংশিকভাবে তার একটা রূপ আছে, যেমন মালার ফুল, কিন্তু সমগ্রভাবে মালার মধ্যেই সে সম্পূর্ণ। 'লিরিক' বলতে লেখক গ্রহণ করেছেন আমাদের সুপরিচিত 'গোল্‌ডেন ট্রেজরি'র সম্পাদক পল্‌গ্রেভ-এর সুবিখ্যাত সংজ্ঞা, যে কবিতার বিষয় মাত্র একটি ভাবনা, একটি অনুভূতি অথবা বিশেষ একটি পরিস্থিতি (সিচুয়েশন)। 'লিরিক' থেকে তাই পল্‌গ্রেভ বাদ দিয়েছেন যে সব কাহিনীধর্মী, বর্ণনামূলক বা উদ্দেশ্যবাচক কবিতা ও যাতে ক্ষিপ্রগতি, অনতিদীর্ঘতা, মানবহৃদয়ের রাগরঙ্গিমা নেই। 'গীতিকাব্য' কথাটাই লিরিক অর্থে গ্রাহ্য; বিশেষ করে লেখক যখন এই গীতিলক্ষণটিকেই করেছেন তাঁর আলোচনার প্রায় প্রধান লক্ষ্য। তবে 'পদকাব্য' বললেই আরও ভালো হয়। কারণ লেখকেরও আলোচ্য বাঙলা পদ-সাহিত্য।

আধুনিক কালের পূর্ব পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যের দুটিই প্রধান ধারা—
পদকাব্য ও পাঁচালী বা মঙ্গলকাব্য। পদ হচ্ছে গীতিকাব্যেরই বাঙলা
নাম, আর ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পৌরাণিক কাব্য ও দেশী
মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি কাব্যকে বলা যায় আখ্যানপ্রধান বা কাহিনীপ্রধান
কাব্য। তাও সুর করেই পড়া হতো, পাঁচালী করে গাওয়া হতো।
ভাসান গানও গান। তবে পদকাব্যের মতো নির্দিষ্ট রাগে গাওয়ার জন্য
রচিত নয়। চর্যাপদ থেকেই বাঙলা সাহিত্যের যাত্রা। পদ বাঙালী মনের
প্রথম সৃষ্টি। মঙ্গলকাব্যের বিষয়ও নিশ্চয়ই পুরনো। কিন্তু বাঙালী নিম্নবর্ণের
জনসাধারণের মধ্যেই মনসা, চণ্ডী প্রভৃতির কথা উদ্ভূত হয়েছে—খাঁটি বাঙলার
জিনিস। ব্রতকথার মতো কথায় হয়তো তা লালিত-পালিত হয়েছে মুখে-
মুখে। তখনো উচ্চবর্ণ তার খোঁজও নিত না। পরে উচ্চবর্ণের এই অবজ্ঞার
স্তর পেরিয়ে এই নিম্নবর্ণের দেবতারা কুলীন দেবতাদের মধ্যে ঠাঁই পেয়েছেন।
তাঁদের মাহাত্ম্যকাহিনীও বর্ণনীয় বিষয় হয়ে উঠেছে উচ্চবর্গের কাব্য-
রচয়িতাদের নিকটে। কারণ, পদ যেমন বাঙালী অন্তর্মুখী মনের একদিকের
সৃষ্টি, মঙ্গলকাব্যও তেমনি তার বাস্তবমুখী মনের প্রমাণ। ভাবপ্রবণতা
আমাদের নিশ্চয়ই মনের প্রধান ধর্ম, কিন্তু জীবনযাত্রার সহজ আকাঙ্ক্ষা,
বাস্তবপ্রবণতাও তার মনেরই ধর্ম। এ প্রশ্ন অবশ্য এখানে আলোচ্য নয়,
তবুও স্মরণীয়। কথা হলো, গীতিকাব্যরূপী পদকাব্যের মূল কোথায়?
শ্রীযুক্ত অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত বলেন তার প্রথম আভাস খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে
পাওয়া যায়—গীত ও মঙ্গলকাব্যে কথার মতো লোকজীবনের ও লোকরীতিরই
দান। কালিদাস প্রভৃতি সংস্কৃত কবিরা এই লোকচর্যাকে স্বীকার করতে
বাধ্য হয়েছেন নাটকে। উচ্চগোষ্ঠীর সঙ্গে তার সম্পর্ক মৌলিক নয় বলেই
নাট্যকাররা মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতকে কৃত্রিম নিয়মে করেছেন গীতির বাহন—
সংস্কৃতকে নয়, শৌরসেনী প্রাকৃতকেও নয়। কোনো অপভ্রংশ কবিরা কিন্তু
এর পরের স্তরে গীতিকাব্যধর্মিতাকে অপভ্রংশ কাব্যে সহজেই গ্রহণ করতে
পারলেন, কারণ বৌদ্ধ ও জৈন কবিদের কাছে উচ্চবর্গের বেদ-বেদান্ত-
শাসিত জীবনযাত্রা ছিল অগ্রাহ্য। লোকচর্যার নৃত্য গীত প্রভৃতি সহজে
তাই তাঁদের কাছে সমাদর পেয়েছে। নৃতাত্ত্বিকরা দেখিয়েছেন, লোকজীবনে
নৃত্যগীতকাব্য প্রায়ই থাকে বিজড়িত, সমাজ-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তা ক্রমশ
হয় স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট। বৌদ্ধ ও জৈন অপ্রভ্রংশে তাই কাব্যের সঙ্গে

গীতের ও নাট্যের একেবারে ছাড়াছাড়ি হয় নি। অলোকরঞ্জনবাবু চতুর্মুখ,
স্বয়ম্ভূ, পুষ্পদন্ত প্রভৃতি জৈন কবিদের লেখা থেকে সুনির্বাচিত উদ্ধৃতি দিয়ে
কথাটা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এঁদের পরেই সেই গীতিধারার প্রকাশ ঘটে
আদি-বাঙলা কবিতায় 'চর্যাপদে'—লেখকের মতে বৌদ্ধ সহজিয়ারাও বৌদ্ধ
বলেই এই পদ-রূপকে সহজে গ্রহণ করতে পেরেছেন। যাই হোক,
'চর্যাপদে' এসে আমরা প্রথমত পয়ার জাতীয় 'পদ' পেলাম। দ্বিতীয়ত, তা
স্তবকীবদ্ধ আর তা অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত মিত্রাক্ষর কবিতা। তৃতীয়ত, তা ভারতীয়
চিরায়ত সঙ্গীতের 'প্রবন্ধ-সঙ্গীতে'র ধারায় বিকশিত গীতিকবিতা। এর মধ্যে
পয়ারের যোগ রয়েছে অপভ্রংশ ১৬ মাত্রার 'পদ্ধতিআ'র সঙ্গে। অন্ত্যানুপ্রাস
এল লোকচর্যার থেকে (মুখ্যত স্মৃতির সহায়ক রূপেই হয়েছিল মিত্রাক্ষর
'ধুর' বা ধুয়ার উদ্ভব)। আর কীর্তনের ক্ষুদ্র গীত বা পদ সহায়তা পেয়েছিল
লোকগীত থেকে যেমন, তেমনি চিরায়ত সঙ্গীতধারা থেকে। কীর্তনের
ছায়ালগ এরূপ মিশ্র রাগ—এই হলো সঙ্গীতজ্ঞদের কথা। এছাড়া, হালের
'গাহাগও সঈ'র কোনো কোনো কবিতার সঙ্গে সবরিপাদের প্রসিদ্ধ চর্যাটি
('উঁচা ঐঁচা পবত' ইত্যাদি) তুলনা করলে দেখা যাবে কী আশ্চর্য মিল দু-এর
রূপকল্পেও। এইরূপ রূপকল্পও সংস্কৃত কাব্যের নয়। যাই হোক, 'চর্যাপদের'
পরে আসে প্রথম জয়দেবের গীতগোবিন্দ—যা অনেকের মতে মূলের বাঙলা
পদের উপরে সংস্কৃতের প্রলেপ মাখানো। রাধাকৃষ্ণ গাথা একটা রাগরঞ্জিত
সঙ্গীতবস্তুরূপে সর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়ে গীতগোবিন্দের প্রসারে। আর তারপর
এল বৈষ্ণব পদাবলীর যুগ—বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস,
রাজশেখর, শশিশেখর প্রভৃতির পদাবলী। একদিকে এ সব পদ (রবীন্দ্রকাব্যের
মতো) অপূর্ব কাব্য। অন্যদিকে কীর্তনের যোগে রাগতাল যুক্ত গীত। আর,
সবই আবার একদিকে বৃন্দাবনলীলার মিলন-বিরহ-গাথার মধ্যে মাল্যাকারে
গ্রথিত ক্ষুদ্র গীত। অন্য দিকে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার ও অধ্যাত্মলীলার
কীর্তন অবকাশেও কবির বিশিষ্ট সত্তার অল্পাধিক আত্মপ্রকাশে লিরিক-এর
এই বিশেষ ধর্মে আলোকিত। অতি-সংক্ষেপে এ গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য এ সব
কথা। কিন্তু শুধু তা বললে লেখকের প্রতি সুবিচার করা হয় না। কারণ,
বহু অন্য প্রতিপাদ্য ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা অনুল্লেখিত থাকে। আর, তাঁর
বিদ্যাবত্তার ও আলোচনা পদ্ধতিরও পরিচয় দেওয়া হয় না। যেমন, বৈষ্ণব
পদাবলী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা; সঙ্গীত, মিল ও ধুয়া; কিম্বা নৃত্যগীত ও

মিল এবং শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন সম্বন্ধে বিশেষ বিচার—এ সব প্রতিটি আলোচনা নিশ্চয়ই অনুধাবনযোগ্য। কিন্তু এখানে স্থানাভাব স্বীকার করতেই হবে।

এই বিশ্লেষণ ও বিচারে তিনি ভারতীয় পুঁথিপত্র ব্যতীত ইওরোপীয় পণ্ডিতদের (কার, কুর্টিস হুইদিঙ্গা প্রভৃতি) নানা বিচার উদ্ধৃতি করে ভারত-ক্ষেত্রে তাঁর প্রযোজ্যতা বিচার করেছেন বিচক্ষণ ভাবে।

যে দু-একটি বিষয়ে প্রশ্ন থেকে যায় শুধু তাই এখানে উল্লেখ করা তবু প্রয়োজন। যেমন মুখ্য কথাটা এই—ভারতীয় লোকচর্যার কথা সংস্কৃত ভাষার কথায়, কাব্যে, সাহিত্য-পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষভাবে স্বীকৃত হত না। এ কথা ঠিক। কিন্তু 'সংস্কৃতের বিষয়বস্তু' বলে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যে বিরাট ভাণ্ডারকে নির্দেশ করেছেন (তা সংস্কৃত ভাষা বা তৎ-সম্পর্কিত ভারতীয় ভাষাতেই নিবদ্ধ) তাতে বহু পরিমাণেই এসে মার্জিত, অর্ধমার্জিত ও অমার্জিতরূপে সঞ্চিত হয়েছিল ভারতীয় লোকচর্যার বস্তু—কথা কাহিনী, ধ্যান-ধারণা, এমন কি প্রকাশরীতিভঙ্গিও কতকাংশে। এগুলো 'সংস্কৃতের বস্তু' হওয়াতে সর্বভারতের উত্তরাধিকারও হয়ে গিয়েছে—হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, সকলের। তবু লোকচর্যার আরও অনেক বস্তু যা তখন অবজ্ঞাত ছিল তা স্বীকৃতিলাভ করে জৈনদের হাতে, বৌদ্ধদের হাতে, এবং ক্রমে ক্রমে হিন্দুদেরও হাতে (যেমন, মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তু)। এই প্রক্রিয়া প্রাচীন ও মধ্যযুগ ব্যাপী বরাবর চলেছে। এ বিষয়ে সন্দেহ বিশেষ নেই—পদ সাহিত্যেরও মূল ওই লোকচর্যার মধ্যেই নিহিত। এজন্যই চর্যাপদকে নববৌদ্ধ সহজিয়ার সৃষ্টি অপেক্ষা সিদ্ধাচার্য বা সহজিয়াতান্ত্রিকদের গুরু পরম্পরায় উপদিষ্ট তত্ত্বোপদেশ বলাই বেশি যুক্তিযুক্ত। বৌদ্ধদের দৌরাত্ম্য, শূন্য, প্রভৃতি ধারণাগুলোকে তা গ্রহণ করলেও যে যৌন-যৌগিক প্রক্রিয়া চর্যাপদের উদ্দিষ্ট তা একান্ত করে বৌদ্ধদের নয়। তাই সহজিয়া তন্ত্র বৌদ্ধধর্ম লোপ পেলেও বৈষ্ণব সহজিয়া পদ রূপে টিকে আছে।

এ কথা বলা অপ্রশংসাসূচক নয় যে, যে-গভীর ও গুরুতর আলোচনার সূত্রপাত শ্রীযুক্ত অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এ প্রবন্ধ গ্রন্থটিতে করেছেন তার শেষ হয়ে গেল না। বরং তা আরম্ভ হলো বলেই আমাদের বিশ্বাস। তিনি স্বল্পায়তনে বিদ্যা, বুদ্ধি, বিচারশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, এ বিশেষ কৃতিত্বের কথা—তাঁর পদ্ধতি ও মতামত দুইই উল্লেখযোগ্য; কিন্তু কালানুক্রমিক পদ্ধতিতে ও ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে এ বিচার তিনি উপস্থিত করলে তা অনুধাবন করা সহজতর হতো।

প্রিয়দর্শী পাঠক

সংস্কৃতি সংবাদ

উইলিয়ম কার্লোস উইলিয়মস

সম্প্রতি মার্কিন কবি উইলিয়ম কার্লোস উইলিয়মস লোকান্তরিত হয়েছেন। ইংরাজী ইমেজিস্ট কবিতা আন্দোলনের সঙ্গে উইলিয়ম কার্লোস উইলিয়মসের নাম জড়িত। আধুনিক কবিতার সূত্রপাতে টি. ই. হিউম ও পরে এজরা পাউণ্ডের নেতৃত্বাধীনে ইমেজিস্ট কবিতা আন্দোলনের ভূমিকা নিতান্ত কম নয়। চীনা ও জাপানী ক্লাসিক কবিতার চিত্রধর্মিতা ও মিতভাষণ এবং য়ুরোপীয় ক্লাসিক কবিতার স্বচ্ছতা ইমেজিস্টদের অন্যতম অন্বিষ্ট ছিল। তদানীন্তন ফরাসী নব্য শিল্প, বিশেষভাবে গত শতকের আশির কবিতা আন্দোলনের সঙ্গে সুপরিচিত আটলান্টিকের উভয় পারের তরুণ কবিবৃন্দ এই শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে কবিতায় ক্লাসিকধর্মিতা কামনা করেন। ঐ সব তরুণ কবি ভিক্টোরীয় রোমান্টিকতা ও জার্জিয় ভাবপ্রবণতা বর্জন করে আঁটোসাঁটো আঙ্গিকে গদ্যছন্দে ও মুক্ত ছন্দে (vers libre) কবিতা রচনায় আগ্রহী হলেন। হিলডা ডু লিটল, এ্যালডিঙটন, ফ্লেচার প্রভৃতির সঙ্গে উইলিয়ম্ কার্লোস উইলিয়মসও যুক্ত হন। প্রতিযুগের নিজস্ব শিল্প আঙ্গিক সে যুগেই তৈরী হয়—এমত বিশ্বাসেই তাঁরা আঁটোসাঁটো আঙ্গিকে নতুন কবিতার সূত্রপাত করেন। এজরা পাউণ্ড কার্লোস উইলিয়মসের সতীর্থও ছিলেন। ব্যক্তিজীবনে কার্লোস উইলিয়মস খ্যাতনামা চিকিৎসক এবং হৃদয়বান বন্ধু ছিলেন। নিচে তাঁর একটি কবিতার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হল।

ভুলে যাওয়া নগর

আমি যে দিন পাড়া-গাঁ থেকে
মার সঙ্গে আসছিলাম, সে দিন ছিল ঝড়ের দিন,
রাস্তার মাঝ বরাবর গাছগুলি দাঁড়িয়ে আর ছোট ডালগুলি
গাড়ির ছাদে ঠোকাঠুকিতে ঝুমঝুমি বাজাচ্ছিল।
গাড়ী দাঁড়ানোর জায়গাগুলি ছাপিয়ে উঠেছে, হাওয়ায়
ভারী পর্দা ঢাকছিল বৃষ্টিধারা। ঘোলাটে তীব্র স্রোত

নতুন নতুন ফাটলে উপছে উঠছিল উপত্যকায়,
যেন আমি যে কোন পথই ধরতে পারি,
দক্ষিণে পশ্চিমে যে কোন দিকে গিয়েই পথ পাবো
শহরে পৌছাতে। পার হয়ে চলেছি
অনতি সাধারণ স্থান, এমন সব স্পষ্ট যে
ঝড় যেখানে সব বাধা ভেঙে ফেলেছে আর পথ দেখিয়ে চলেছে
কেমন অদ্ভুত সাধারণ পথে: দীর্ঘ, পরিত্যক্ত বীথিকা সরণী
পথের কোণে কোণে অচেনা সব নাম আর
মাতালের মত দেখতে লোকজনের একেবারে আগাগোড়া
ভিনদেশী আচার আচরণ। মনুমেণ্ট, সংগঠন
আর এক জায়গায় অনেকখানি জমা জল
আমাকে চমকে দিলো এক একর কিংবা তারও বেশি
উষ্ণ জলের তীব্ররেখ ধারার সুনিয়মিত উচ্ছ্বাসে। পার্কগুলি।
আমার কোন ধারণাই ছিল না, আমি তখন কোথায়···মনে মনে
বললাম, কোন একদিন আমি খুঁজে পেতে চিনে নিতে ফিরে আসব
এই সব পরিশ্রমী আর অদ্ভুত লোকজন, যারা বাস করে
এই সব খুপড়িতে···এই সব তীক্ষ্ণ পথের কোণ
আর কৌতূহল জাগানো বীথিকা সরণীর বাঁক
যাদের বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে এমন
আপাত সামান্য যোগাযোগ। কেমন করে ওরা
এ রাস্তাটি আমাদের খবরের কাগজগুলির খবর হবার
বা অন্য প্রচারযন্ত্রের আওতার বাইরে আলাদা রেখেছে, যখন
কেন্দ্র নগরীর বুকের এত কাছে, এতটা নিকটে যখন
পরিচিত আর বিখ্যাত নামের নামাবলীতে ঘেরা॥

তরুণ সান্যাল

সম্পাদকীয়

অন্নদাশঙ্কর

সাহিত্য একাদেমির পুরস্কার এবার লাভ করেছেন 'জাপানে' গ্রন্থটির জন্য শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়। তাঁকে আমাদের সানন্দ অভিনন্দন জানাই।

'জাপানে'র পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্করেরও না। সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাবের সঙ্গে প্রায় প্রথম দিন থেকে যে দু' একজন সাহিত্যিক সকলের অভিনন্দন লাভ করেছেন, অন্নদাশঙ্কর তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। এই সৌভাগ্যকে তিনি প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরে পোষণ করেছেন সযত্নে ও সম্পূর্ণ আত্মসচেতন সাধনায় এবং নিন্দা-প্রশংসার প্রতি দৃক্‌পাত না করে একমাত্র আপনার শুভবুদ্ধি ও বিবেকের অনুমোদনানুযায়ী। সাহিত্যের যে আদর্শ তিনি গল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে, কবিতায়ও অনুসরণ করেছেন ইদানীংকালে, তাতে পুরস্কার পারিতোষিক প্রভৃতি তাঁর দিকে প্রবাহিত না হওয়ারই কথা। তাই তাঁর পুরস্কার লাভ সত্যই উল্লেখযোগ্য—কারণ, সাহিত্যক্ষেত্রেও পুরস্কার-পারিতোষিক প্রভৃতি এ কয় বৎসরে প্রায় অর্থহীন হয়ে গিয়েছে।

বলা নিষ্প্রয়োজন—শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্করের সঙ্গে আমাদের মতের মিল অনেক সময়েই ঘটে নি,—ভবিষ্যতেও হয়তো ঘটবে না। মনের মিলও আছে কিনা জানি না। কিন্তু যে মানুষ জীবনে ও সাহিত্যে অকৃত্রিমতার সাধনা করেছেন,—নিজ শক্তিতে আস্থা ও মানবতায় আস্থা যাঁর সুসমন্বিত,—সকল সাময়িকতার ওপরেও রেখেছেন নিজের সত্যাসত্যের সাধনাকে অম্লান ও অনির্বাণ—তাঁর সঙ্গে মনের মিল খুঁজে না পেলে অস্বস্তিই বোধ করতে হয়। অন্তত শ্রদ্ধার সঙ্গেই বিচার্য তাঁর মত, অনুধাবনযোগ্য তাঁর সাহিত্যরীতি।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ

৭৮ বৎসর বয়সে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের দেহাবসানে (২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩) আবেগপ্রবণ ভারতবাসী শোকবিহ্বল হয় নি. শ্রদ্ধানম্র ব্যথায় স্মরণ করেছে ভারত প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতিকে; বহু সংগ্রামে জয়ে-পরাজয়ে সমাকীর্ণ ভারত-জীবনের গত পঞ্চাশ বৎসরের বিরাট পর্বটিকে, আর সেই সঙ্গে সেবায়, অনুদ্ধত সংকল্পে, স্নিগ্ধ সহৃদয়তায় সার্থক সেই নির্বিরোধ মানুষটিকে যিনি

রাজনীতিতেও ছিলেন অজাতশত্রু, ব্যক্তিজীবনে শান্ত শুদ্ধ চরিত, সমাজজীবনে আক্ষুদ্র সকলের সেবাব্রত বন্ধু।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ কৃতী ছাত্র, কৃতী ব্যবহারজীবী। ছাত্র জীবনেই তিনি তখনকার নবজাগ্রত বিহারের কর্মব্যস্ত নায়ক—'বিহার ছাত্র সমিতির' প্রতিষ্ঠাতা। ভারতীয় মহাজাতি যে ক্ষুদ্র-বৃহৎ অঙ্গজাতিদের সংহতিতেই মহাজাতিক সঙ্ঘে সংহত হয়ে উঠবে, স্বতন্ত্র বিহার প্রদেশ গঠনের উদ্যোগে-আয়োজনেও (১৯০৫-১৯১১) এই সত্যই জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে তখন অনুভূত হয়েছিল। সেই নব গঠিত বিহার ও ওড়িষ্যায়ও রাজেন্দ্রবাবু নায়করূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান নি, সেবকরূপেই আপনার সাধনা স্থির করে নিয়েছিলেন। গোখলের 'সার্ভেন্ট অব্ ইণ্ডিয়া সোসাইটির' সেবাদর্শই ছিল তাঁর আদর্শ। রাজনৈতিক কর্তৃত্বের জন্য যে উচ্চাশা আবশ্যক, তা সত্যই তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য যে ভাবাদর্শ তারই ফলে গান্ধীজী ও রাজেন্দ্রপ্রসাদের মতো আজন্ম নির্বিরোধ ও সেবাধর্মী মানুষেরা স্বদেশসেবার জন্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আকৃষ্ট হয়েছেন ; আর সেই সেবাদর্শেই চেয়েছেন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি ; তারই প্রেরণায় বাধ্য হয়েছেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হতে, বারে বারে নির্যাতীত হয়েও নিরুত্তাপ হৃদয়ে জয় করে নিতে স্বদেশসেবার জন্মগত অধিকার। গান্ধীজীর পরেই তাই, ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের ভাবাদর্শের প্রতীকরূপে গণ্য রাজেন্দ্রপ্রসাদ। অবশ্য সেই ভাবাদর্শেরই অনুগামী আরেকটি প্রেরণা—স্বাধীনতালাভের পূর্বক্ষণ থেকে—আমাদের সংগ্রামে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে থাকে, আর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুই উদারনৈতিক আধুনিকতার প্রবক্তারূপে তার মুখপাত্র হয়ে দাঁড়ান। গান্ধীজীর রাজেন্দ্রবাবুর বিদায়ের সঙ্গে তাই একটা যুগ শুধু নয়, একটা বিশেষ যুগাদর্শও শেষ হয়ে আসছে।

সবই শেষ হয়—কিন্তু সেই ত্যাগ ও সেবার প্রয়োজন কোনো দিনই শেষ হয় না। অথচ জাতীয় জীবনেও ত্যাগ ও সেবার প্রয়োজন কোনো দিনই শেষ হবে না।

রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে একটা যুগ শেষ হচ্ছে। নিরভিমান, শান্ত, সৌজন্যের প্রতিমূর্তি রাজেন্দ্রপ্রসাদের প্রতি সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা নিবেদনের সঙ্গে তাই আরও বেশি করেই এই প্রশ্ন মনে জাগে—এই আত্মশাসনবিমুখ বিক্ষিপ্ত চিত্ত কালের মধ্যে সেদিনের কোনো ত্যাগ, কোনো তপস্যা, কোনো সনম্র সাহসেরই কি প্রয়োজন আর নেই ?

গোপাল হালদার

৬। পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেডের যে সকল অংশীদার মূলধনের একশতাংশের অধিকারী তাঁদের নাম ও ঠিকানা :

১। গোপাল হালদার, ফ্লাট নং ১৯ ; ব্লক "এইচ", সি. আই. টি. বিল্‌ডিংস্, ক্রিস্টোফার রোড, কলকাতা-১৪ ॥ ২। সুনীলকুমার বসু, ৩৩ ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, কলকাতা-৪ ॥ ৩। অশোক মুখোপাধ্যায়, ৭ ওল্ড বালিগঞ্জ রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ৪। হিরণকুমার সান্যাল, ৮ একডালিয়া রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ৫। সাধনচন্দ্র গুপ্ত, ২৩ সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা-১৭ ॥ ৬। স্নেহাংশুকান্ত আচার্য, ২৭ বেকার রোড, কলকাতা-২৭ ॥ ৭। সুপ্রিয়া আচার্য, ২৭ বেকার রোড, কলকাতা-২৭ ॥ ৮। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ৫বি ডাঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯ ॥ ৯। সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ১।৩ ফার্ন রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ১০। শীতাংশু মৈত্র, ১।১।১ নীলমনি দত্ত লেন, কলকাতা-১২ ॥ ১১। বিনয় ঘোষ, ৪৭।৪ যাদবপুর সেন্ট্রাল রোড, কলকাতা-৩২ ॥ ১২। সত্যজিৎ রায়, ৩ লেক টেম্পল রোড, কলকাতা-২৯ ॥ ১৩। নীরেন্দ্রনাথ রায়, ৪৬।৭এ বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১৯ ॥ ১৪। হরিদাস নন্দী, ২৯এ কবির রোড, কলকাতা-২৬ ॥ ১৫। ধ্রুব মিত্র, ২২বি সাদার্ন এভিনিউ, কলকাতা-২৯ ॥ ১৬। শান্তিময় রায়, ৯৭ বালিগঞ্জ গার্ডেনস, কলকাতা-১৯ ॥ ১৭। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, ৭ ডোভার লেন, কলকাতা-১৯ ॥ ১৮। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য ॥ ১৯। নিবেদিতা দাশ, ৫৩বি গরচা রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ২০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ৯০।১ বৈঠকখানা রোড, কলকাতা-৯ ॥ ২১। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলকাতা-২০ ॥ ২২। শান্তা বসু, ১৩।১এ বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৬ ॥ ২৩। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬২ ডাঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯ ॥ ২৪। ধীরেন রায়, ১০।৬ নীলরতন মুখার্জি রোড, হাওড়া ॥ ২৫। বিমলচন্দ্র মিত্র, ৬৩ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৩ ॥ ২৬। দ্বিজেন্দ্র নন্দী, ১৩ডি ফিরোজ শাহ্ রোড, নয়াদিল্লী ॥ ২৭। সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ৫০ রামতনু বসু লেন, কলকাতা-৬ ॥

পরিচয়

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের

৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১। প্রকাশের স্থান—৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

২। প্রকাশের সময়-ব্যবধান—মাসিক

৩। মুদ্রক—সত্য গুপ্ত ; ভারতীয় ; ২৯ নর্থ রেঞ্জ ; কলকাতা-১৭

৪। প্রকাশক— „ „ „ „ „

৫। সম্পাদকদ্বয়—(ক) গোপাল হালদার ; ভারতীয়

(খ) মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ; ভারতীয়

২৬।৩ হিন্দুস্থান পার্ক, কলকাতা-২৯

দাম : এক টাকা



পরিচয়

চৈত্র ১৩৬৯

সু.